প্রকাশনার ৩৫ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

পঁয়ত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ১০

অক্টোবর ২০২০ ॥ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭ ॥ সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

আনিস মাহমুদ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)

মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আমাদের মাঝে আবার ফিরে এসেছে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস। এই মাসে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূল (সা) পৃথিবীর বুকে আগমন করেছিলেন এবং এই মাসেই তিনি ওফাত লাভ করেন। মানব জাতির এক ক্রান্তি লগ্নে মহান রাব্বুল আলামিন রাসূল (সা)-কে পৃথিবীর বুকে সর্বশেষ নবী রাসূল হিসেবেই পৃথিবীতে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। মানব জাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত পথের দিশা দেয়ার জন্যই সর্বশেষ নবী রাসূলের শেষে প্রেরণ করেছেন। আর তাই বলা যায় বিশ্ব মানবতার দিশারী, মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত রাসূলে পাক (সা)। পবিত্র কুরআন শরীফ-এর অসংখ্য জায়গায় মহান রাব্বুল আলামিন রাসূলে পাক (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। হাদিস শরীফ সমূহেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা পাওয়া যায়। মানব সভ্যতা বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবদান আজ সকল মানুষ ধর্ম মতের কাছেই স্বীকৃত। বিশ্ব মানবতা, বিশ্ব সভ্যতা যখন প্রচণ্ডভাবে হুমকির সম্মুখীন ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখনই তাঁর প্রিয়

হাবীবকে এই পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেন। হিংসা, বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে, গোত্র গোত্রে কলহ, পাপ পঙ্কিলতায় পূর্ণ পৃথিবীতে শান্তির অমিয়ধারা নিয়ে এসেছিলেন রাসূলে পাক (সা)। তৎকালীন আরব জাতিকে মহান রাব্বুল আলামিন এর কালেমার পতাকার তলে একত্রিত করেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে আল্লাহ তাআলার প্রদর্শিত পথে আহ্বান জানিয়েছেন মহানবী রাসূল (সা)। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আল্লাহর বাণী মানব জাতির দ্বারে পৌঁছেছে। বিশ্বে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ দূর করে আল্লাহর একত্ববাদকে তিনি দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন আদর্শকে বুকে ধারণ করে পৃথিবীর বুকে তা প্রচার করার জন্য তাঁর উম্মতের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা)-এর শুভাগমন এই পবিত্র দিন ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)-এ আমরা যেন আল্লাগর বাণী আল কুরআন এবং তাঁর জীবনাদর্শ আল হাদিসের আলোকে নিজেদেরকে আমৃত্যু রাখতে পারি রাব্বুল আলামিন এর দরবারে এই মুনাজাত করি। আল্লাহ তাআলার প্রদর্শিত পথ এবং রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে পৃথিবী সকলের জন্য শান্তিময় হোক মহান রাব্বুল আলামিন এর দরবারে আমরা এই মুনাজাতও জানাই।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন অপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক খাঁটি বাঙালি মুসলমান। উনার জীবন দর্শনে বার বার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য জাতির পিতাকে নিয়ে একশ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী ও মৌলবাদী নানা রকম অপপ্রচার চালিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ কখনো তাদের সেই অপপ্রচার বিশ্বাস করেননি। মুজিব শতবর্ষে বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর এম. ইনায়েতুর রহিম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখেছেন। এই লেখাটি জাতির পিতার বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচারের একটি শক্ত প্রতিবাদ। অগ্রপথিকের পাঠকেরা লেখাটি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। ১৫ আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করুন। আমিন।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

মুফতী শাঈখ মুহাম্মদ উছমান গনী
ফাতিহায়ে দোয়াজদাহুম, মিলাদুন্নবী (সা) ও সীরাতুন্নবী (সা) ♦০৯
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শের এক অনন্য দৃষ্টান্ত মহানবী (সা) ♦১৩
ড. মো. মোরশেদ আলম সালেহী
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষমা ও উদারতা♦১৮
ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
বাণিজ্যিক কাফেলায় হযরত মুহাম্মদ (সা) : তাঁর নীতি ও আদর্শ♦২৪
ডা. মাওলানা নবীর আহমেদ
বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এর শিক্ষানীতি♦২৯
মো. আবুল কাসেম ভূইয়া
বিশ্বনবীর বিস্ময়কর মুজিযা♦৩৬
মো. আবদুন নূর
ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবীর আগমন সংবাদ♦৫২

আন্তর্জাতিক

মূল : ড. মাহমুদ এম আইয়ুব
অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ
মুসলমানদের জীবনে ও চর্চায় আল-কুরআন♦৬৯

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম
বঙ্গবন্ধুর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা♦৭৭

স্মরণ

মিলন সব্যসাচী
বঙ্গবন্ধুর রাখা ঐতিহাসিক নাম শেখ রাসেল♦৮৬

কবিতা

খালেক বিন জয়েনউদদীন
তোমার নামের পরশ♦৯২
প্রত্যয় জসীম
প্রয়োজন প্রিয়জন♦৯৩
আনোয়ার কবির
ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল♦৯৪
আবুল হোসেন আজাদ
বিশ্বনবী মোহাম্মদ রাসূল (সা) ♦৯৫
শেখ দুলাল
আঁকি তোমার বৈচিত্র্য ছবি♦৯৬
দেলওয়ার বিন রশিদ
রাসূলুল্লাহ প্রিয় তাই♦৯৭
গোলাম নবী পান্না
তোমার দয়ালু প্রভাব♦৯৮
কাওসার ফিরদৌসী
একাকিত্ব ♦৯৯

গল্প

শামীম আহমেদ সৃজন
ছাড়পত্র♦১০০

সাহিত্য

গাজী সাইফুল ইসলাম
বজর সবর : রুদাকি পুরস্কার- ১৯৮৯ বিজয়ী তাজিক কবি ও রাজনীতিক♦১০৪

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ইসলামে শিক্ষকের মর্যাদা ও অধিকার♦১১১

ই'ফা সংবাদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় শোক দিবস পালন♦১২২

পরশমণি

আল-কুরআন

১। আপনি বলে দিন, আল্লাহর ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) এর উপর তারা যেন খুশি উদযাপন করে। এটি তাদের অর্জিত সমুদয় সঞ্চয় হতে উত্তম। (সূরা ইউনুস : ৫৮)

২। স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি কিতাব ও হিকমত যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি এরপর যদি তোমাদের নিকট এমন রাসূল আসেন যিনি তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন করবেন তখন তোমরা সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করেছ? এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (আলে ইমরান : ৮৯)

৩। তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন আর তোমরা তাঁর নিয়ামতের মাধ্যমে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে আর তোমরা জাহান্নামের উপকণ্ঠে উপনিত হয়েছিলে। তিনি সেখান থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুঝতে পার। (আলে ইমরান : ১০৩)

৪। আমি আপনাকে সমগ্র জাহানের জন্য কেবল রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

আল-হাদীস

১। হযরত ইরবাদ বিন সারিয়া (রা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসেবে লিখিত ছিলাম যখন আদম (আ) কাদা মাটির মাঝে মিশ্রিত ছিল। আর অচিরেই আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। আমি হলাম ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফসল, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের ঐ দর্শন যেটা মা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, তিনি আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছেন এমতাবস্থায় তার থেকে একটি নূর বের হলো যা তাঁর সামনে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করেছিল। (সারহুস সুন্নাহ লিলবাগাভী, মিশকাত)

২। হযরত আবু কাতাদা (রা) একদা তাঁকে প্রতি সোমবার রোযা পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, এ দিন আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ দিনই আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। (মুসলিম, মিশকাত-১৭৯)

৪। হযরত কা'ব আহবার (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নিশ্চয়ই হযরত আদম (আ) ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টবস্তু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সৃষ্টির কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (বায়হাকী)

৫। হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন: আমার নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি যদি আপনাকে পয়দা না করতাম তাহলে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করতাম না। (মারফু সূত্রে, দায়লামী শরীফ)

৬। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অপরাপর মানবমণ্ডলী থেকে অধিকতর ভালোবাসার পাত্র হবে না। (বুখারী শরীফ)

প | বি | ত্র | ঈ | দে | মি | লা | দু | ন্ন | বী | (সা)

ফাতিহায়ে দোয়াজদাহুম

মিলাদুন নবী ও সীরাতুন নবী (সা)

মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

বিশ্বের বিস্ময়, নবী ও রাসূলগণের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্ব নবী হযরত আহমাদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাঁর গুণ কীর্তনে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান এমনকি নাস্তিকরা পর্যন্ত পঞ্চমূখ; কাফির মুশরিক- জানের দুশমনরাও যাঁকে 'আল আমীন' তথা মহাসত্যবাদী বা পরম বিশ্বাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি; যাঁর আবির্ভাবে কিসরা ও কাইসারের গগণচুম্বী রাজপ্রাসাদ ভূমিতে লুটে পড়ে; পারস্যের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড চির নির্বাপিত হয়; দেবালয়ের প্রস্তর মূর্তি মর্তে কপাল ঠুকে; তাঁর সে শুভাগমনকে বিশ্ব বিবেক ক্ষণিকের তরেও ভুলতে পারে না। বর্ষের তিনশত পঁয়ষট্টিটি দিবসই যদি তাঁর পবিত্র মহা মীলাদ বা জন্ম স্মরণ করা হয় তথাপিও রোজ কিয়ামত

পর্যন্ত এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। তাই তো সারা দুনিয়া প্রতি মূহূর্তে গাইছে: "সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা।"

বালাগাল উলা বি কামা-লি হী, কাশাফাদ দুযা বি জামা-লি হী; হাছুনাত জামিউ খিছ-লি হী, ছল্লু আলাইহী ওয়া আ-লি হী। "সবার উপরে আসন যাঁর; তাঁর রূপের ঝলকে কেটেছে আঁধার, সকল কিছুই সুন্দর তাঁর; দুরূদ তাঁকে ও তাঁর পরিবার।"

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব দিবসটি আমাদের সমাজে ফাতেহায়ে দোয়াজদাহুম নামেও পরিচিত। 'ফাতেহায়ে দোয়াজ দাহুম' কথাটি ফারসী ভাষা হতে আগত। দোয়াজদাহুম মানে বারো, ফাতেহায়ে দোয়াজদাহুম অর্থ হলো বারো তারিখের ফাতিহা অনুষ্ঠান। কালক্রমে এ দিনটি মীলাদুন নবী (সা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর অর্থ হলো নবী (সা)-এর জন্ম অনুষ্ঠান। ধীরে ধীরে এর সাথে 'ঈদ' শব্দ যোগ হয়ে 'ঈদে মীলাদুন নবী (সা)' রূপ লাভ করে। যার অর্থ হলো মহা নবী (সা)-এর জন্মোৎসব। এ পর্যায়ে আরেকটি পরিভাষাও প্রচলিত হতে থাকে 'সীরাতুন নবী (সা)' অর্থাৎ নবী (সা) এঁর জীবন চরিত বা জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠান।

এ মহামানবের জন্মতারিখ নিয়ে সীরাত গ্রন্থ, জীবনীকার, ইতিহাসবেত্তা ও জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে প্রায় সকলে এ বিষয়ে একমত যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসের শুক্লপক্ষে সোমবার প্রত্যুষে বা ভোর বেলায় তথা উষালগ্নে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে সেদিন ছিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল। জ্যোতির্বিদদের হিসেব মতে এ দিন ১, ২ বা ৮, ৯ অথবা ১০, ১১ রবিউল আউয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আর তিনি ইহধাম থেকে চিরবিদায় নেন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ দ্বিতীয় সোমবার অপরাহ্নে বা গোধূলিলগ্নে। অনেকের মতে নবীজি (সা) ১৭ রবীউল আউয়াল শুক্রবার বসন্তের সুরভী ও অমীয় বারতা নিয়ে ধরাধামে শুভাগমন করেন এবং কৃষ্ণপক্ষের শেষ সোমবার ২৮ ছফর পৃথিবীকে শূণ্য করে চিরবিদায় নেন। তবুও তাঁর বেলাদাত ও ওফাত ১২ই রবীউল আউওয়াল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তদুপরি প্রিয় নবী (সা)-এর আগমন ও প্রস্থান একই দিনে একই সময়ে এ কথাও সর্বজন বিদিত। তাহলে এ দিনে জন্মোৎসব পালন করা হবে নাকি প্রস্থানের শোক পালন করা হবে? কথায় আছে: সৃষ্টির জন্য যাঁদের সৃষ্টি, তাঁরা চির অমর। তাই হোক তবুও প্রিয় নবী (সা) আজ দুনিয়ার বুকে নেই, সেটিই ভাববার বিষয়। যাই হোক উৎসব বা শোক পালন বড় কথা নয়; আসল কথা হলো- তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা; কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা; একমাত্র ইসলামকেই ইহকালীন

শান্তি ও পরকালীন মুক্তির অনন্য পথ হিসেবে গ্রহণ করা। তবেই আমাদের এ আনন্দ ও বেদনা উভয়ই স্বার্থক হবে।

অতি পরিতাপের বিষয় যে, রবিউল আউয়াল মাস আসলে আমরা আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করি। বাণী আর বিবৃতি প্রচার করি; কিন্তু ফরজ ওয়াজিব আদায় করি না, হারাম সুদ পরিত্যাগ করতে পারি না, দুর্নীতি ও ঘুষ ছাড়তে পারি না, মিথ্যা বর্জন করতে পারি না, লোভ হিংসা মোহ মুক্ত হতে পারি না। এমন হয় কেন? তবে কি নবীপ্রেমের তাৎপর্য আমাদের অন্তরে স্থান পেয়েছে?

মনুষ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। নবী রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাই আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল (সা)-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ রাসূল (সা) যা যা করেছেন বা করতে বলেছেন, তা করতে হবে। আর যা করেননি বা করতে বারণ করেছেন তা বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা: 'যা দিয়েছেন তোমাদের রাসূল (সা) সুতরাং তা ধারণ কর; আর যা থেকে বারণ করেছেন, তা হতে বিরত থাক।' (সূরা হাশর-৫৯: ৭)।

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে– 'বলুন (হে রাসূল সা!) যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসবে, তবে আমার অনুকরণ কর; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' (সূরা বাকারা-৩: ৩১)। হাদীস শরীফে আছে: 'তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি হবো তার নিকট তার পিতা পুত্র ও সকল মানুষ (এবং যাবতীয় সবকিছু) হতে প্রিয়।' এ আলোকে নিশ্চিত করে বলা যায়, রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের পূর্বশর্ত। আর এ ভালোবাসা তাঁর নির্দেশ পালন ও অনুকরণের মাঝেই প্রকাশ পাবে। আমরা যখন উৎসব বা দুঃখ প্রকাশ করি তখন কি আমরা সে প্রকৃত ভালোবাসা ও আনুগত্যের কথা চিন্তা করি? না আমরা মিষ্টি খাওয়া বা একটা আনুষ্ঠানিক প্রথাই পালন করি।

হ্যাঁ, মিষ্টি খাওয়াও সুন্নাত বটে! তবে কথা হলো আমরা বর্তমানে শুধু মিষ্টি জাতীয় সুন্নাতগুলো পালনে অতিমাত্রায় যত্নশীল হয়ে পড়েছি। কিন্তু কতগুলো সুন্নাতের কথা আমরা একেবারেই ভুলতে বসেছি। যেমন: দুঃস্থ ও আর্তের সেবা করা, গরীব দুঃখীর দেখাশোনা করা ও মানব কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো বহু বিষয় রয়েছে যা রাসূল (সা) করেছেন ও করতে বলেছেন; সেগুলো আমাদের জন্য সুন্নাত এমনকি অনেকগুলো ফরজও বটে। কিন্তু আমরা সে সম্পর্কে উদাসীন। যাও কিছু করি তাও কি

পরিপূর্ণ করতে পারি? না; বরং শুধু যে কোন একটা দিক নিয়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করি। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ নিজের কর্মপরিধি বাড়ানোর পরিবর্তে অন্যসবার সমালোচনা করে তৃপ্তি লাভ করি। যার দরুণ নিজের অসম্পূর্ণতা ও অন্যের অসহযোগিতার ফলে পরাভূত হই বার বার।

মিলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো জন্মলগ্ন বা জন্ম সম্পর্কে আলোচনা। আমাদের পরিভাষায় মিলাদ বলতে বুঝি- প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এঁর জন্ম ও জীবনী আলোচনা এবং তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে: 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (সা)-এঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ তাঁর প্রতি রহমতের দুআ করেন; হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ ও যথাযথরূপে সালাম পেশ কর। (সূরা আহযাব-৩৩: ৫৬)।

এ বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কাব্য গ্রন্থ, পুথি-পুস্তক, গল্প-উপন্যাস, কল্পকাহিনী, ছড়া-ছন্দ, পদ্য-গান, লিখিত হয়েছে; লেখা হচ্ছে আরো বহু লিখিত হবে। এর তাৎপর্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অরো হবে। তবুও এটা নিশ্চিত যে, সব ব্যাখ্যার সার ব্যাখ্যা, সব কথার সার কথা যাতে সকলেই একমত যে, মিলাদুন নবী (সা)-এর মূল শিক্ষা হলো একমাত্র কালিমা তয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। আল্লাহ ভিন্ন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর প্রেরিত।' এ কালেমার গূঢ়ার্থ হাজারো প্রকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অথচ অতি সংক্ষিপ্ত ও অতি নিখুঁত বিশ্লেষণ হলো ঈমানে মুজমাল- 'বিশ্ব প্রভু আল্লাহর প্রতি আমি ঈমান আনলাম, তাঁর সকল আদেশাবলী মেনে নিলাম।'

মোদ্দা কথা মিলাদুন নবী (সা)-এর আসল শিক্ষা হলো– মহানবী (সা)-এর তেইশ বৎসরের ভালোবাসার, কঠোর সাধনার পরিপূর্ণ ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবনবিধান ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে সর্বস্তরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তির ধর্ম ইসলামকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করা। আর এটাই নবী বা রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য; যা পবিত্র কুরআনে বার বার বিবৃত হয়েছে– 'তিনি সে মহান প্রভু যিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন, সঠিক পন্থা ও সত্য ধর্ম সহযোগে, যাতে সে ধর্মকে প্রকাশ করতে পারেন সর্ব ধর্মের শিখরে।' (সূরা তাওবা-৯: ৩৩/ সূরা ফাৎহ-৪৮: ২৮)।♦

মহানবী (সা)

অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক। চিন্তায় তিনি ছিলেন উদার আচরণে নম্র ও বিনয়ী। ব্যক্তিত্বে বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এক বিরল মহামানব। উত্তম চরিত্র ও মহানুভবতায় সর্বকালের মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। শুধু তাই নয়, তাঁর কর্মময় জীবনে রয়েছে কুরআনের আদর্শে গড়া সমাজসংস্কার, ন্যায় বিচার, দক্ষ প্রশাসন পরিচালনার উজ্জীবনী শক্তি। যার বাস্তব প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত মানবজাতির কাছে যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক, সহসী যোদ্ধা ও সফল ধর্মপ্রচারকের স্বীকৃতি অর্জনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন।

মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর কেবল সেটাই তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। আর যা কিছু অশুভ তা তিনি পরিহার করেছেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কুরআনে বলেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ'। (সূরা আল-আহযাব : আয়াত ২১)

মহানবী (সা) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নম্র-ভদ্র, বিনয়সুলভ উত্তম ব্যবহার ও সততার দ্বারা মানুষের মন জয় করেছেন। ফলে ইসলাম বিদ্বেষী ঘোর দুশমনেরাও একবাক্যে স্বীকার করেছে, তিনি ছিলেন বিনয়-নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তারা ধর্মীয় কারণে তাঁর বিরোধিতা করলেও তাঁর চারিত্রিক বিষয়ে কখনো কোনো কালিমা লেপন করেনি। না-দিয়েছে কোনো অপবাদ। বরং তারা তাঁকে 'আল-আমিন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তাঁর এই চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল-কালাম : আয়াত ৪)

যে কাফিরেরা একদিন মহানবী (সা)-কে আল্লাহ তায়ালার সত্য বাণী প্রচারের কারণে তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যে বাণীর মাঝে নিহিত তাদের মুক্তি। ছিল তাদের কল্যাণ। সেই মহানবী (সা) যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, তিনি প্রতিশোধ পরায়ণ না-হয়ে আদর্শ দিয়ে তাদের মন জয় করতে চাইলেন। অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সার্বিক নিরাপত্তা চিন্তা করলেন। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করলেন। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনালয়কে সুরক্ষিত রাখার সুযোগ দিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে কখনো কোনো অমুসলিমের উপর চাপিয়ে দেননি। তবে তিনি তার প্রজ্ঞা-দূরদর্শিতা ও চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে ইসলাম গ্রহণের জন্য মানুষকে আহ্বান জানালেন। আর এ জন্য জীবনে অনেক জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নিজের জন্মভূমিকে ছাড়তে হয়েছে। দ্বীনের দাওয়াতের জন্য তায়েফের ময়দানে রক্ত ঝরাতে হয়েছে। এ ধরনের জঘণ্য কাফিরেরাও যখন তাদের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়েছে তিনি নিজ গুণে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। কোনো দিনই ব্যক্তিগত কারণে কোনো অমুসলিমের উপর প্রতিশোধ নেননি। বরং অমুসলিমদের অধিকার রক্ষায় বলেছেন, 'যে কোনো অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দিলো আমি তার (অমুসলিমের) বাদী হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো, কিয়ামতের দিনে আমি হবো বিজয়ী'। অমুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন, 'তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের ধনসম্পদ আমাদের ধনসম্পদের মতো।'

তিনি কখনো মানুষকে ছোট ভাবতেন না। হেয় প্রতিপন্ন করতেন না। তাঁর প্রতিটি কাজে ও কর্মে বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত। আচার-আচরণ ও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। শক্তিমান মানুষের চিরায়ত স্বভাব, দুর্বলকে ছোট ভাবা। তাকে কটাক্ষ করে কথা বলা। তার মনে আঘাত দেয়া। কিন্তু না, মহানবী (সা) তাঁর পুরো জীবনে এমন কোনো কাজ করেননি। এমনকি মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে অসাধ্য কোনো কাজ করতেও বাধ্য করেননি। তিনি মানুষের সাথে উত্তম আচরণে পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন

করেছেন। তাঁর এই মহান চারিত্রিক মাধুর্য সর্বকালের মানুষের জন্য আদর্শ। তারা তাঁরই আদর্শে নিজেদের বিকশিত করার অনুপ্রাণিত হবে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, 'আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

তিনি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের সাথে মিশতেন। সবাইকেই তার মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করতেন। তাঁর কাছে ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মানুষের বড় পরিচয় সে একজন মানুষ। আর সকলে আল্লাহর সৃষ্টি। আর মানুষ হয়ে মানুষ কখনো অহমিকা প্রকাশ করতে পারে না। এটা তার জন্য শোভনীয় নয়। তিনি দরিদ্র অসহায় মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। তিনি তাদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতেন। মানুষের বিপদে এগিয়ে যেতেন। তিনি নম্র-ভদ্র আচরণ করার জন্য সাহাবিদের পরামর্শ দিতেন। অকারণে ক্রোধ পরিহার করার জন্যও সাহাবিদের বলতেন। তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নম্র-বিনয়ী হয় আল্লাহ তায়ালা তাকে উচ্চাসনে আসীন করেন। আর যে অহংকারী হয় আল্লাহ তায়ালা তাকে অপদস্থ করেন।' (মিশকাত)

মহানবী (সা) অমুসলিমদের সাথেও উত্তম আচরণ করতেন। বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। তার এই নমনীয়তা ও কোমলতার কারণে যারা একবার তাঁর সাহচর্যে এসেছিল তারা তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসত। গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তাঁর কোমলতা ও নমনীয়তা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'নবী করিম (সা) কঠোর ভাষী ছিলেন না, এমনকি প্রয়োজনেও তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতেন না। আর প্রতিশোধপ্রবণতা, তা-ও ছিল না তাঁর মধ্যে। মন্দের প্রতিবাদ তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং তিনি উত্তম আচরণ দিয়ে মন্দের প্রতিবাদ করতেন। আর ক্ষমাকে তিনি সব বিষয়েই প্রাধান্য দিতেন। এতটা বিনয় ও নম্র ছিলেন তিনি, কথা বলার সময় কারো মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টি রাখতেন না। আর কোনো অশোভনীয় বিষয়ও তিনি উল্লেখ করতেন না।'

তিনি সবসময় হাসিখুশি মুখে মানুষের সাথে কথা বলতেন। অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন তিনি। তাঁর সুন্দর শব্দ চয়ন ও বাচন ভঙ্গিতে সবাই অভিভূত হতো। তাঁর সুন্দর অভিভাষণ শুনে মানুষ অশ্রু সংবরণ করতে পারত না। তিনি যে কত দয়ালু! কত উদার! যা তাঁর বাস্তব জীবন ও দর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সামনে উম্মোচিত হয়। তিনি দয়ার নবী। মানবতার প্রতিচ্ছবি। কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে খালি হাতে ফেরেনি। নিজে না-খেয়ে অপরকে খাইয়েছেন। মানুষকে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো, অনাহারীকে খাদ্য দাও, সালামের বহুল প্রচলন করো এবং এসব কাজের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করো।' বুখারি ও মুসলিম শরিফের অন্য এক

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-কে প্রশ্ন করলো, ইসলামে সবচেয়ে ভালো কাজ কোনটি? তিনি তার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'অভুক্তকে খাওয়ানো আর পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম করা।'

মহানবী (সা) যেমন সহজ-সরল মানুষ ছিলেন তেমনি তাঁর জীবন-যাপন ছিল অনাড়ম্বর। ছিলো না কোনো লোভ, ছিল না অহংকার। অত্যন্ত নরম মনের অধিকারী পরোপকারী একজন আদর্শ মহামানব। একবার এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর দরবারে এলো, সে মহানবী (সা)-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও ভাব-গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল। মহানবী (সা) তার এ অবস্থা দেখে তাকে স্বাভাবিক করার জন্য বললেন, 'থামো, নিজেকে সংযত করো! আমি তো এমন এক মহিলার গর্ভজাত সন্তান, যিনি শুকনো গোশত ভক্ষণ করতেন।'

মানুষের সাথে এমন সদালাপী, খোশমেজাজী, উদার ও সুমহান ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল। একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজে মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে মানুষের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও বিনয়ী ভাব অবলম্বন করো। কেউ যেন অন্যের ওপর গর্ব ও অহংকারের পথ বেছে না নেয়। আর কেউ যেন কারো ওপর জুলুম না-করে।' (মুসলিম)

কাপড় সেলাই থেকে শুরু করে জুতা মেরামত, দুগ্ধ দোহন সহ নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ নিজেই করতেন। বাজারে গিয়ে বাজার করে নিয়ে আসতেন। কখনো কখনো অন্যদের কাজেও সহায়তা করতেন। এমনকি নিজে রুটি তৈরি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে খেতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে অবস্থানকালে পরিবারের কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি নামাজের জন্য উঠে যেতেন।'

হযরত আনাস (রা) বলেন, 'পরিবারের প্রতি এত অধিক স্নেহপরায়ণ হিসেবে আমি নবী করিম (সা) থেকে বেশি অগ্রগামী আর কাউকে দেখিনি। তিনি দিন-রাত্রির সময়টাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন- এক ভাগ ইবাদত-বন্দেগি করতেন, অন্য ভাগে পরিবার-পরিজনের জন্য ঘরোয়া যাবতীয় কাজকর্মগুলো সম্পন্ন করতেন। আর এক ভাগ সময়ে তিনি দরিদ্র-অসহায় মানুষের জন্য জনসেবার কাজে ব্যয় করতেন। সাধারণত কোনো জরুরী অবস্থা দেখা না-দিলে এ নিয়মের ব্যত্যয় কখনো ঘটত না।

মহানবী (সা)-এর মহানুভবতায় সিক্ত হযরত আনাস (রা) আরো বলেন, 'আমি দশ বছর মহানবী (সা)-এর খেদমত করেছি। আমার কোনো কাজে

কখনো তিনি আপত্তি করে বলেননি, এমন কেন করলে? বা এমন করোনি কেন?' মহানবী (সা)-এর পালকপুত্র জায়েদ। যাকে উকাজ মেলা থেকে কিনে এনেছিলেন হযরত খাদিজা (রা)। এরপর সে মহানবী (সা)-এর স্নেহ-মমতায় বড় হতে লাগলো। এক সময় বিপুল ধনসম্পদের বিনিময়ে তাঁর বাবা-চাচা তাঁকে ফেরত নিতে এলো। তখন সে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। অথচ তিনি তাদের সাথে যাননি। বরং তাদেরকে বলেছিলেন, আমি মহান ব্যক্তির মহানুভবতা সম্পর্কে অবগত। তাঁর সান্নিধ্যের বিনিময়ে দুনিয়ার অন্য কোনো সান্নিধ্য আমার কাম্য নয়।

সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনিই কলেমা পড়নেওয়ালা সমস্ত মানুষের একমাত্র আদর্শ। প্রতিটি কাজেকর্মে তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে সবার। তবেই জীবন হবে সুন্দর। কর্ম হবে পুণ্যময়। কারণ তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যেই রয়েছে আল-কুরআনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তাই মনে-প্রাণে তাঁকে ভালোবাসতে হবে। অনুসরণ করতে হবে তাঁকে অথাৎ তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাহর। জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আল-কুরআনের বিধি-বিধান। মহানবী (সা) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো।' অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ইচ্ছা ও কামনা আমার আনিত আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হবে।'

রাসূলের ভালোবাসা অর্জন করতে হলে যেমনি তাঁর অনুসরণ করতে হবে তেমনি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে হলে অবশ্যই রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। সুতরাং রাসূলের আনুগত্যের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো।' (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ৩১)

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল।' (সূরা নিসা : আয়াত ৮০) তাই আল্লাহর আনুগত্য কোনোভাবেই রাসূলের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে কোনোভাবেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে পরিপূর্ণ দ্বীন বোঝার তাওফিক দিন। আর সঠিক আমলের বরকতে জান্নাতের উচ্চ মাকামে আসীন করুন। ♦

লেখক : শিক্ষক, পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পিরোজপুর।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষমা ও উদারতা

ড. মো. মোরশেদ আলম সালেহী

মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী অধ্যয়নে দেখা যায়, তাঁর চাক্ষুষ জাত শত্রুকে তিনি হাসিমুখে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবুওয়াতির শুরু জামানায় তিনি যখন তায়েফে কালিমার দাওয়াত দিতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তায়েফ কর্তৃক আক্রান্তও হয়েছিলেন। তখন খাদেম জায়েদ ইবনে হারেছাহ বলেছিলেন, আপনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করুন; তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, আপনি হুকুম দিন! তায়েফের দুপাশের পাহাড় এক করে দিয়ে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দিই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কী বললেন? না! আমি বদ-দু'আর জন্য প্রেরিত হয়নি। আমি রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অবলীলায় ক্ষমা করে দিলেন ওই জঘন্য অমানুষগুলোকে।

একারণেই আল্লাহ তায়াল ঘোষণা দিলেন : 'তোমাকে কেবল বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরণ করেছি।'

মানবসভ্যতার ইতিহাসের তাঁর মতো এমন উদার ও ক্ষমাশীল মানুষ ছিল না, এখনো নেই কিয়ামত অবদি আসবেও না। একটি আদর্শ ও মহৎ চরিত্রভাবনা কল্পনা করলে প্রথম যে বিষয়গুলো আসে তার অন্যতম হলো ক্ষমা। মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলির অন্যতম একটি গুণ হলো ক্ষমাশীলতা। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ক্ষমা গুণটির কথা পবিত্র কুর'আনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু (সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৩)'।

শুধু এক স্থানে এই ক্ষমার আলোচনা করেননি বা ক্ষমা নামক মহৎ গুণের কথা বলেননি। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের গুণ ক্ষমার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নবীজি (সা)-কে এই গুণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন–

"আপনি ক্ষমা করতে থাকুন, আর ভাল ভাল কাজের আদেশ দিতে থাকুন, আর মূর্খদের (সঙ্গে অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক) এড়িয়ে চলুন (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৯৯)।

এই আয়াত প্রসঙ্গে একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক প্রশ্নের জবাবে হজরত জিবরাঈল (আ) বলেন, যে কেউ আপনাকে অত্যাচার করলে তাকে আপনি ক্ষমা করে দিন। যে লোক আপনাকে কিছু দেয়া থেকে বিরত করে তাকে আপনি দান করুন। যে লোক আপনার সঙ্গে আত্মীয়র সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন। এখানে যে বিষয়টি ফুটে ওঠেছে তা হলো আপনি মূর্খদের মতো আচরণ করবেন না। যে যাই বলুক আপনি আপনার কাজ করুন আর তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"তোমরা ক্ষমা করো এবং এড়িয়ে চলো" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১০৯)।

সমাজে ঐ ব্যক্তিকেই মহৎগুণের অধিকারী বলা হয়, যার মধ্যে ক্ষমা করার সৌজন্যতা আছে। ক্ষমা না করে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়ার দ্বারা অধিকাংশ সময় বিষয় ফায়সালা হয় না। একটি নষ্ট আচরণ বা অন্যায় দূর করতে রাগ ক্রোধ কঠোর আচরণ কড়ামেজাজ ও প্রতিশোধ পরায়ণতা যতটুকু কাজে আসে, তার থেকে শতগুণ বেশি কাজে আসে ক্ষমা করার দ্বারা।

ইতিহাস থেকেই এর জলন্ত উদাহরণ, যেমন-মক্কাবিজয়ের কথা আমরা সকলেই জানি। কী ঘটেছিল ঐদিন? মক্কার কাফেরদের ভেতরে শুরু হয়ে গেছে ভয়ানক ঝড়-ঝঞ্ঝা যে, আজকে কারো ক্ষমা নেই, মুহাম্মাদের হাতেই আজ আমাদের মরতে হবে। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন! শুধু মক্কার কাফের বেঈমানগোষ্ঠী নয়, পুরো পৃথিবী অবাক হয়ে গেছে রাসূলুল্লাহ (সা) ক্ষমার ঘোষণায়। তিনি ঘোষণা করলেন আজ আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে

আসি নাই, তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। আজ কারো পাপ নেই, অপরাধ নেই। ক্ষমার আওয়াজ যখন মক্কার আকাশে আলোড়ন তুললো, খোদ কাফের বেঈমানগোষ্ঠীই হতবাক। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে, তিনি তাদেরকে বললেন–

"হে কুরাইশগণ! তোমাদের সঙ্গে এখন আমার আচরণের ধরন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? তারা বলল, আপনি উদার ও ক্ষমাশীলের ভাই ও উদার ও ক্ষমাশীল ভাইয়ের ছেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যাও, তোমরা মুক্ত।"

তিনি তাঁর ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে করা সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। এইও কী মানুষের দ্বারা সম্ভব? যাদেরকে ঘর-বাড়ি ছাড়া করেছি, যাদের রক্তে হাত রাঙ্গিয়েছি, যাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেছি জনমের জনম; তারা আমাদের হাতের নাগালে পেয়েও ক্ষমার করে দিল? না, এটা মানুষের কাজ হতে পারে না। আসমানের মালিকের পক্ষ থেকে নেমে আসার অবতার। এই অনুভূতির ঢেউ তরঙ্গে তাদের হৃদয়ের গহীনে ঈমানী জাগরণ তুললো। দলে দলে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হাত রেখে ঈমান গ্রহণ করলো। কষ্টকর একটি ক্ষমার ঘটনা হাজারো লাখো মানুষ সুপথে এসেছে। ইতিহাসের পাতায় আপন মর্যাদায় স্বমহিমায় সেই ক্ষমার ঘটনা বিরাজমান।

আল্লাহ তায়ালা কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

"তোমরা যদি (কোন জুলুমের) প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততটুকুই নেবে, যতটুকু জুলুম করেছে আর যদি ধৈর্য-ধারণ করো, তাহলে জেনে নাও ধৈর্যধারণকারীরাও শ্রেয়। এবং (হে নবী! আপনি ধৈর্যধারণ করুন। কারণ আপনার ধৈর্য তো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই। আপনি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে সংকীর্ণ হবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসানের অধিকারী হয় (সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬-১২৭)।

১. পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা) রহমতস্বরূপ মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন :

" আমি অন্যদেরকে অভিশাপ দেয়ার জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইনি এবং আমি তোমাদের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"

পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

"তোমাকে কেবল বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আমাদের শেষ নবী (সা) চিরজাগরুক থাকবেন,

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। দয়ায়, ক্ষমায়, দানে, কর্মে, উদারতায়, মহত্ত্বে, জ্ঞানে, ধর্মে সাইয়িদুল মুরসালিন, প্রিয় নবী (সা) সর্বকালের মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

মুহাম্মদ (সা) ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রদর্শনপূর্বক দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমাজে পরিবেশ গড়ে তোলেন; মানুষের মন-মেজাজকে তৈরি করেন; বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদতরূপে চিহ্নিত করেন। দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে মানবিক আচরণের মাধ্যমে তিনি তাদের মনুষ্য পর্যায়ে উন্নীত করেন; পরিবারের সদস্যরূপে বিবেচনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের পথে কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারিত্রিক সনদ দিয়ে বলেন–

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কার অধিবাসীদের সাথে চলাফেরা করেছেন, তার এই দীর্ঘ জীবনে কারো সাথে কোন খারাপ আচরণ করেছেন খুঁজে পাওয়া যায়না। এ সম্পর্কে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত, অহীর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা (রা)-এর কাছে এসে নিজের জীবনাশঙ্কার কথা বলতেছিলেন, ঐ সময় আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা (রা) বলেছেন :

"কখনও নয় আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনও দুশ্চিন্তায় ফেলবেননা, আপনি আপনজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করে থাকেন। ঋণগ্রস্তদের দায়িত্ব করে থাকেন। দরিদ্রজনের সাহায্য করেন। অতিথিদের সেবা করেন। সত্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকেন এবং বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।"

ক্ষমা ও উদারতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত : অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞা : এ প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান ইব্ন সালিম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

"মনে রেখো যদি কোন মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে

কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষ অবলম্বন করবো। ”

এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে, রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে ক্ষমা করলেন : এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

“একদা জনৈক বেদুঈন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করল। তখন লোকেরা তাকে বাধা দিতে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে কোমল ও সুন্দর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, রুঢ় আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি।”

“একবার তাঈ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এতে তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্দি হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের এক মেয়েও ছিলো। যখন সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বললেন যে, সে হাতেম তাঈয়ের মেয়ে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন।”

মহানবী (সা)-এর সুদীর্ঘ সোহবতপ্রাপ্ত জামাতা হযরত আলী (রা) তাঁর মহান চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মন্দের বদলা মন্দের দ্বারা নিতেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। তিনি কখনো কারো ওপর হাত তুলেননি একমাত্র জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া। কখনো কোন খাদেম কিংবা মহিলার উপর হাত উঠাননি। কোন প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ নিতে কেউ তাঁকে কখনো দেখেনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর নির্ধারিত হুদূদ বা সীমারেখা লংঘন করেছে। যখন আল্লাহর কোন হুকুম লংঘিত হতো তখন তিনি সবচেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত হতেন। (শামায়েলে তিরমিযী; আস্‌সীরাতুন্নববিয়্যাহ-সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা : ৩৪৩)

মোনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে গমন করে তাকে কবর থেকে বের করার নির্দেশ দেন। এরপর তার লাশ স্বীয় হাঁটুর ওপর রাখেন, মুবারক মুখের পবিত্র থুথু তার শরীরে দেন এবং নিজের পরিধেয় জামা তাকে পরিয়ে দাফন করেন। (বুখারী, কিতাবুল জানাইয ১/১৮২)

ক্ষমা ও উদারতার ফযীলত

সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না; বরং সামাজিক সম্প্রীতির স্বার্থে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে

গ্রহণ করাকেই শ্রেয় মনে করতেন। তিনি ইরশাদ করেন, যে মুসলমান মানুষের সাথে মিলে থাকে এবং তাদের কষ্ট ও আঘাত সহ্য করে সে ঐ ব্যক্তি থেকে অধিক শ্রেয় যে কারো সাথে মিলে না এবং কারো কষ্ট সহ্য করে না (তিরমিযী; মিশকাত ২/৪৩২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, দানে কোনোদিন ধন কমে না; ক্ষমার কারণে আল্লাহ কেবল মর্যদাই বৃদ্ধি করেন। আর যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার সম্মান অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম; তিরমিযী ২/২৩)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিষ্ণুতার মর্যাদা তুলে ধরে বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করেন, হে রব! তোমার নিকট কোন বান্দা বেশি মহিমান্বিত? জবাবে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। (মিশকাত ২/৪৩৪)

হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর উদারতার বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর খাদেম হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দশ বছর ধরে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার কোনো আচরণে বিরক্ত হয়ে কখনো উহ্ বলেননি এবং কখনো বলেননি যে, অমুক কাজ কেন করলে? অমুক কাজ কেন করলে না? (মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল ২/২৫৩)

এমনি আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে। সবগুলো অধ্যয়ন করলে মোটামুটি যে কথাগুলো বের হয় তা হচ্ছে : ক্ষমা করা কষ্টসাধ্য হলেও এর ফল সুমিষ্ট, ক্ষমাকারী যেমন আল্লাহর প্রিয়পাত্র তেমনি মানুষেরও প্রিয়পাত্র। ক্ষমা ও উদারতা একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিনের জীবনের উপাদান। মানুষ যখন উক্ত গুণে গুণান্বিত হয় তখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শে জীবন গঠন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।♦

বাণিজ্যিক কাফেলায় হযরত মুহাম্মাদ (সা) ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁর নীতি ও আদর্শ

ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। প্রকৃত মানুষ সম্মানিত হয় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে। মানুষের জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য গ্রহণ ও অন্যান্য জীবনোপকরণের ভোগ-ব্যবহার অপরিহার্য। এ জন্যে তার আয়-উপার্জন করার বিকল্প নেই। প্রকৃত মানুষ হবার জন্যে হালাল উপার্জন অবশ্যম্ভাবী। হালাল উপার্জনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস্য ব্যবসা-বাণিজ্য।

জগত ও জগতবাসীর জন্যে মহান আল্লাহর রহমত ও করুণা হলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তিনি রাহবর ও রাহনুমা। তিনি মানবতার মুক্তিদূত। তিনি সর্বজনের আদর্শ। নিজের জীবন যাপনের জন্যে এবং সকল মানুষের শিক্ষার জন্যে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য চর্চা করেছেন। জনজীবনের অন্যান্য শাখার ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ পদচারণা ছিল।

মহান আল্লাহ নিজ প্রজ্ঞায় প্রিয়নবী (সা)-কে স্বীয় মাতৃগর্ভে পিতৃহীন করে দেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকালের পর তিনি লালিত পালিত হতে থাকেন চাচা আবু তালিবের গৃহে। চাচা আবূ তালিবের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল

না। শিশু মুহাম্মাদ (সা) চাচার কষ্টের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চাচার কষ্ট লাঘবে তিনি মেষ-বকরি চরাতেন এবং সাংসারিক কাজে কায়িক শ্রম দিতেন।

এক পর্যায়ে তিনি চাচা আবূ তালিবের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করলেন। উকায, মাজান্না প্রভৃতি বাণিজ্য মেলাগুলোতে তিনি চাচার পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। নিজের সততা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জনে সক্ষম হতেন।

এক পর্যায়ে তিনি চাচার সফরসঙ্গী হয়ে মক্কার বাহিরে যেতে শুরু করেন। বাণিজ্যিক কাফেলায় প্রথম সিরিয়া সফরের সময় তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, কতক দক্ষ ও নেতৃস্থানীয় কুরাইশী ব্যবসায়ীসহ আবূ তালিব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রিয়নবী (সা) তাঁদের সহযাত্রী হলেন।

ইয়াহূদী যাজক বুহাইরা-এর এলাকায় পৌঁছার পর বাহনগুলো চারণ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা যাত্রা বিরতি করলেন। এ সময় ইযাহূদী যাজক তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতে এল। ইতিপূর্বে তাঁরা বহুবার ওই পথে যাতায়াত করেছেন, কিন্তু যাজক কখনো তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতও করেনি, তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। যাত্রীগণ তাঁদের মালপত্র সামলাচ্ছিলেন। যাজক হন্ত-দন্ত হয়ে তাঁদের মাঝে কি যেন খুঁজতে লাগল। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত চেপে ধরে বলল, ইনি যে বিশ্বনেতা, ইনি তো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁকে রাহমাতুললিল আলালামীন তথা বিশ্ব জগতের জন্যে রহমতরূপে নবুওয়াত প্রদান করবেন। কুরাইশী লোকজন বলল, আপনি কিভাবে তা জানতে পেরেছেন? সে বলল, আপনারা যখন পর্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে আসছিলেন তখন এমন কোন বৃক্ষ ও পাথর ছিল না যে তাঁকে সিজদা করেনি। এরাতো নবী ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে না। তদুপরি তাঁর কাঁধের নিম্নাংশে থাকা ডালিম আকারের সীলমোহর দেখে আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। যাজক তার আস্তানায় গিয়ে কাফেলার জন্যে ভোজের আয়োজন করল এবং তাঁদের নিকট খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন উটের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে ডাকা হল। তিনি আসছিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে একখণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। কাফেলার নিকটবর্তী হবার সাথে সাথে সকলে মেঘের ছায়ায় ঢুকে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জায়গায় আসন গ্রহণের পর ছায়াটি অন্যদের উপর থেকে সরে এসে তাঁর ওপর স্থির হয়ে গেল। যাজক বলল, দেখুন ছায়াটি তাঁর নিকট চলে গিয়েছে।

বাণিজ্যিক কাফেলায় প্রিয়নবী (সা)-এর সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর ছিল হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রতিনিধি হিসেবে। এ সফরে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন খাদীজার গৃহকর্মী মাইসারাহ। খাদীজা (রা) মাইসারাহকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

– সাবধান, তুমি তাঁর কোন নির্দেশ অমান্য করবে না এবং তাঁর কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে না।

কাফেলা সিরিয়ার বুশরা বাজারে এলে প্রিয়নবী (সা) নাসতুরা নামক এক ইয়াহূদী যাজকের আস্তানার পাশে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিলেন। যাজক নাসতুরা অবিলম্বে বেরিয়ে এল এবং মাইসারাকে বলল, এই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণকারী ব্যক্তি কে? মাইসারাহ বলল, কুরাইশ বংশীয় হারাম অঞ্চলের একজন অধিবাসী। যাজক বলল, নবী ছাড়া অন্য কেউ তো কখনো এই বৃক্ষের ছায়ায় বসতে পারেনি। আচ্ছা বল তো, তাঁর চক্ষুদ্বয়ে কি লাল আভা আছে? মাইসারাহ বলল, হ্যাঁ আছে। যাজক বলল ওহ! এই তো প্রতিশ্রুত শেষ নবী। মাইসারাহ এর অগোচরে যাজক সরাসরি প্রিয়নবী (সা)-এর নিকট গিয়ে তাঁর মাথা ও পদযুগল চুম্বন করল এবং বলল, আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাওরাতে উল্লিখিত শেষ নবী। এরপর সে বলল, প্রতিশ্রুত নবীর সকল নিদর্শন আমি আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মাত্র একটি ছাড়া। আচ্ছা! আপনি কি আপনার পিঠের কাপড়টি একটু সরাবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করলেন। যাজক নবুওয়াতী সীলমোহর দেখতে পেল এবং প্রিয়নবী (সা)-কে চুমু খেয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই আর আপনি সেই শেষ নবী ঈসা (আ) যাঁর সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত, এই বাণিজ্যিক সফরে প্রিয়নবী (সা) প্রচুর মুনাফা অর্জন করে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মাইসারাহ বলেছিল, হে মুহম্মাদ (সা)! আমরা খাদীজা (রা)-এর পক্ষে ৪০ বছর যাবত ব্যবসা করে আসছি। কিন্তু কখনো এত লাভ-মুনাফা দেখিনি। প্রিয়নবী (সা) বাণিজ্যিক সফরে বাহরাইন, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়েছিলেন বলেও বর্ণনা রয়েছে।

প্রিয়নবী (সা)-এর বাণিজ্য চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের হালাল উপার্জনের দ্বার উন্মুচন করা, যা তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করবে। ব্যবসায় বাণিজ্যে সফলতা অর্জনে তিনি কতক নীতি ও আদর্শ রেখে গিয়েছেন যা উম্মতের জন্যে নিশ্চিত কল্যাণকর।

ব্যবসা বাণিজ্য হতে হবে হালাল ও বৈধ কাঠামোতে। প্রিয়নবী (সা) বলেছেন,

– হালাল উপার্জনের সন্ধান করা অন্যতম একটি ফরয।

- সততা ও আমানতদারী কল্যাণকর ব্যবসার অপরিহার্য অঙ্গ। প্রিয়নবী (সা) বলেছেন,

– সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথী হবে।

- বৈধ ব্যবসায় একে অন্যের সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ বলেছেন– তোমরা পুণ্য কর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে, পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে না।
- হালাল ও বৈধ ব্যবসায় নিয়োজিত থাকা মূলত আল্লাহর নির্দেশ পালন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

  – নামায শেষ হলে (জুমআর নামায) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে। আয়াতে অনুগ্রহ অর্থ জীবিকা ও সম্পদ।
- ব্যবসায়ী যথাসম্ভব নিজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায় সম্পৃক্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, – উত্তম উপার্জন হলো স্বহস্তে সৎ ব্যবসালব্ধ উপার্জন।
- ব্যবসা বাণিজ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি অপরিহার্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না, তবে তোমাদের সম্মতিভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্য হলে তা ভিন্ন বিষয়।'
- ব্যবসায়-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো অবশ্যই সাবালক ও সুস্থমস্তিষ্ক হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

  – তিন প্রকারের ব্যক্তির উপর শরীআতের দায় আরোপিত হবে না। পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও নাবালক-অপ্রাপ্ত বয়স্ক।
- বিক্রেতা পণ্যদ্রব্যের বৈধ মালিক এবং ক্রেতা বিনিময় মূল্যের বৈধ মালিক হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, বর্ণনাকারী বলেছেন– যা আমার মালিকানায় নেই তা বিক্রয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন।
- বিক্রয় পণ্য বৈধ ও ভোগ ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। নিষিদ্ধ ও অবৈধ পণ্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, – তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত...
- ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য থাকবে সকল পক্ষের লাভ, মুনাফা ও কল্যাণ। কোন পক্ষের অকল্যাণ ও ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য থাকলে ওই ব্যবসা বৈধ হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,– কেউ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিসাধন করবে না।
- সুদ কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

– আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

- ব্যবসা বাণিজ্যে ঠকবাজি ও প্রতারণা নিষিদ্ধ। বর্ণনাকারী বলেছেন,

– রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন, কংকর নিক্ষেপজনিত বেচাকেনা এবং প্রতারণাপূর্ণ ব্যবসা বাণিজ্য।

- ক্রয় উদ্দেশ্য নয় বরং ক্রেতা সেজে মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে দালালী করা নিষেধ। হাদীস শরীফে এসেছে,– রাসূলুল্লাহ (সা) লেনদেনে জালিয়াতি ও ফটকাবাজি করতে নিষেধ করেছেন।
- সংকট তৈরির অসৎ উদ্দেশ্যে মালামাল গুদামজাত করে রাখা মহাপাপ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

– যে ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে মালামাল গুদামজাত করে রাখে সে পাপী।

ব্যবসা-বাণিজ্য আয় উপার্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। প্রিয়নবী (সা) ছিলেন বৈধ ও কল্যাণময় ব্যবসার পথিকৃৎ। উম্মতের জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণে তিনি সার্বজনীন নীতি ও আদর্শ রেখে গিয়েছেন। সে সকল নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে মানবজাতি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে ব্রতী হবে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।♦

বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষানীতি

ডা. মাওলানা নবীর আহমেদ

আদর্শ জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিশজনীন জাতি গঠনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। ইসলাম মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ। এ আদর্শের ভিত্তিতে মানবজীবন গঠনের এক সুমহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এ আদর্শের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে নিয়ে গঠন করে তাকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শুধুমাত্র মানুষকে ইসলামের আদর্শ শিক্ষা দানের মাধ্যমেই তিনি এ বিরাট বিপ্লব। ইসলামী বিপ্লব ছাড়া বিনা বল প্রয়োগে শুধু শিক্ষা দানের মাধ্যমে পৃথিবীতে আর কোন বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও মূর্খতার চরম অন্ধকারে নিপতিত একটি অধপতিত জাতিকে শুধুমাত্র আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে একটি শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত করে দেখিয়ে গেছেন। গঠন করে গেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব গোষ্ঠী। এ ছিলো একটি অনন্য আদর্শবাদী মানব সমাজ। কোন

দিক থেকেই তাদের সাথে পৃথিবীর কোন মানব গোষ্ঠীর তুলনা হয় না। এখানে আমরা আলোচনা করে জেনে নিতে চাই যে, কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) এই অনন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবগোষ্ঠীটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষানীতির কতিপয় দিক

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার নবী ও রাসূল। সর্বশেষ নবী। নবুয়তি মিশনের সবশেষ আদর্শ। তাঁর পরে এ বিশ্বজগতে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবেনা। তাই তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবুয়তি মিশনের শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করেছেন। এ কারণেই তাঁর প্রদত্ব শিক্ষা কাঠামো ছিলো সবদিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ ষোলকলায় সমৃদ্ধ, সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পরিপাটি। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মিত হয়েছিল মানব জাতির ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর শিক্ষানীতি কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠির জন্য নয় বরং বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। তা কোন বিশেষ যুগ বা কালের জন্য রচিত হয়নি বরং সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের মুক্তির দিশা তাতে রয়েছে। তাই তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষানীতি সর্বজনীন ও চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এই চিরন্তন শিক্ষানীতির বিকল্প কোন শিক্ষানীতি মানবতার জন্য সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর হবেনা। তাঁর দেয়া শিক্ষাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শ্বাশত ও সর্বজনীন শিক্ষাদার্শ হিসেবে চিরন্তন মূল্যাইত থাকবে। সেই আদর্শ শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো-

১। জ্ঞানের মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হলো জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হলেন মহান আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলাই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস ও প্রকৃত মালিক। আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজীদে বলেন, " ক্বুল ইন্নামাল ইলমু ঈনদাল্লাহি" হে নবী বলুন, আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক। (সূরা মুলক, ৬৭:২৬, সূরা আহকাফ-৪৬:২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে, "ওয়াল্লাহু আলীমুন হাকীম" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়। (সূরা- নিসা ০৪:২৬)।

প্রকৃতপক্ষে গোপন ও প্রকাশ্য দৃশ্য-অদৃশ্য, মূর্ত-বিমূর্ত সব কিছুর জ্ঞানতো কেবল মহান আল্লাহ কাছেই রয়েছে এবং একমাত্র তারই নিকট আছে। "হুওয়াল্লাহুল্লাজী লা'ইলাহা ইল্লাহু আলিমুল গয়বী ওয়াশশাহাদাতি" অর্থাৎ তিনিই মহান আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুর জ্ঞানের অধিকারী। (সূরা হাশর, ৫৯:২২)

প্রকৃতপক্ষে মানুষ এতোটাই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী যে, তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) অসীম জ্ঞান সীমার নাগালের ধারে কাছেও পৌঁছার ক্ষমতা রাখে না। তবে তিনি ইচ্ছে করলে মানুষকে যতোটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে কেবল মাত্র ততোটুকু জ্ঞানই অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:- "ওয়াল ইউহীতুনা বিশায় ইম্মিন ইলমিহী ইল্লা বিমাশাআ) অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কোন কিছুই মানুষ নিজের আয়ত্তাধীন করতে পারেনা, তবে তিনি যতটুকু চান"। (সূরা বাকারা, ২:২৫৫)

মানুষদেরকে তিনিই জ্ঞান দান করেন। তবে মানুষদেরকে তিনি অতি সামান্যতম জ্ঞানই দান করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "ওয়ামা উতীতুম্মিনাল ইলমি ইল্লাকলীলা) তোমাদেরকে জ্ঞানের কোন অংশ দেয়া হয়নি, তবে সামান্য মাত্র।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮৫) অতএব, মানুষের জন্য কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট জ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করা তাঁরই শেখানো দু'আ দ্বারা। "ওয়াকুর রাব্বি ঝিদনী ইলমা" অর্থাৎ বলো, প্রভূ আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দাও। (সূরা তোয়াহা- ২০:১১৪) মহান আল্লাহ তা'আলা সকল জ্ঞানের আধার আর মানুষ সেই মহান সত্তার জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য জ্ঞানী। সুতরাং মানুষের উচিত হবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা। রাসূলে আরাবী (সা) তাঁরই জ্ঞানের উপায়ে শিক্ষা দিয়ে অন্ধকার আচ্ছন্যতায় ডুবে থাকা মানবতাকে আলোর সন্ধান দিয়ে তাদের জীবনকে আলোকময় করে তুলেছিলেন।

২। জ্ঞানের মূলসূত্র হচ্ছে ওহী বা নবুয়ত : জ্ঞানের মূল উৎস হলো আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। এই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জ্ঞান লাভের সূত্র হলো অহী বা নবুয়ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের মধ্য থেকেই কিছু কিছু ব্যক্তিকে নবী-রাসূল নিযুক্ত করেছেন। তাদের কাছে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। তাঁর মাধ্যমে তিনি মানবতার মুক্তির জন্য পূর্ণ জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন। যে পদ্ধতিতে নবী-রাসূলগণের কাছে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়, তার পারিভাষিক নাম হলো-ওহী। হযরত মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী-রাসূল হবার কারণে তার মাধ্যমে অবতীর্ণ শিক্ষা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। এ শিক্ষা আমাদের কাছে দুইভাবে সংরক্ষিত আছে। এক, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে। দুই, হাদীসে রাসূল বা সুন্নাতে রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে। কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণ

নির্ভুল একটি গ্রন্থ। একেকটি শব্দসহ গোটা গ্রন্থটাই সকল ধরনের সন্দেহ সংশয়ের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। এর প্রতিটি বাক্য ও শব্দ হুবহু। আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে অবতীর্ণ।

এ হচ্ছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অনাবিল সূত্র। হাদীসে রাসূল মূলত কুরআন মাজীদেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। কুরআনুল কারীমকে নবুয়্যতি পন্থা ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হাদীসে রাসূলের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। তাই দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যই জ্ঞানের এই মূল সূত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এছাড়া বিকল্প নেই।

কুর'আনুল হাকীমে বলা হয়েছে: "এই কুরআন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর সাহায্যে তোমাদের সতর্ক করতে পারি। (সূরা আন আম-৬:১৯)

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "নিঃসন্দেহে তুমি এই কুরআন এক মহাবিজ্ঞ সর্বজ্ঞানী সত্তার নিকট থেকে লাভ করেছো। (সূরা নামল -২৭:০৬)

কুর'আন মাজীদের অপর আয়াতে বলা হয়েছে: আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন আর তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিলোনা। (সারা নিসা ৪:১১৩) , কুরআনে আজীমে আরো বলা হয়েছে: এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে যা সম্পূর্ণ সরল ও সোজা পথ। আর যারা একে মেনে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে। (সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৯)

কুরআন নাযিলের মাসে বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়েতে ভরপুর কুরআনই হলো মূল শিক্ষা। তার থেকে শিক্ষা নেয়াই হলো মানবতার মূল কল্যাণ। আল্লাহ তা'আল বলেন, "রমাযান মাস। এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে গোটা মানব জাতির জন্য রয়েছে জীবন যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট শিক্ষায় পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে। (সূরা- আল বাকারা ২:১৮৫)

৩। সত্যিকারের বা মূল শিক্ষক হলেন নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা) নিজেই : বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে আকরাম (সা) যে শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তার মূল শিক্ষক হলেন সায়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই। কী শিক্ষা দিতে হবে? সেই শিক্ষানীতিই বা কী হবে? আর শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন হবে? কোন পদ্ধিতিতে শিক্ষা দান করতে হবে? এ সকল ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই হলেন মহাত্তম আদর্শ। তিনি হচ্ছেন মহান আদর্শ শিক্ষক। তাঁকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

তাই মুসলিমগণের শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণ করতে হবে তাঁরই পদাংক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:- "তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা। ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি আশাবাদী (সূরা আল- আহযাব ৩৩:২১)। তিনি শুধু নমুনাই নন। বরং মুমিনগণের জন্য তাঁর নমুনা গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। জীবনের সকল কিছু গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে কেবল মাত্র তারই শিক্ষার ভিত্তিতে।

তাই, কুরআনে আজীম বলছে: "আল্লাহ তা'আলার রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছে তাই গ্রহণ করো আর যা বর্জন করতে বলে, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর- ৫৯ঃ৭)

অন্যত্রে বলা হয়েছে 'হে নবী! তাদেরকে বলো: তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমাকেই অনুসরণ করো।' (সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১)

এতএব, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য রাসূল্লাহ (সা)-এর প্রণিত বা রেখে যাওয়া আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থাই একান্ত কাম্য।

৪। আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব নীতি শিক্ষা ব্যবস্থা : আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সা)-এর গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাহলো মানুষ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃত মালিক ও পরিচালক এক ও লা শরীক মহান রাব্বুল আমীনের দাস। তাঁর দাসত্ব করার জন্যই তিনি মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর দাস মানুষদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্য। তাই মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য। (সূরা আয যারিয়াত, ৫১:৫৬)

এ দাস মানুষদেরকে পৃথিবীতে যে তাঁর প্রতিনিধিও নিযুক্ত করবেন, এ কথা মানুষ সৃষ্টি করার প্রাক্কালেই তিনি আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআন বলছে: "যখন তোমার প্রভূ ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন: পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি বানাবো। (সূরা আল বাকারা ২:৩১)

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে দিয়ে তাকে মহান আল্লাহ তা'আলার সত্যিকারের দাস ও প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলাই হলো এই শিক্ষানীতির মূল কথা। আর এটাই হচ্ছে মানুষের জন্য প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই নবুয়্যতি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হলা আদর্শ নাগরিক তৈরি নয়, মূলত আদর্শ মানুষ তৈরি করা।

এই শিক্ষানীতি মানুষদেরকে যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাহলো, মানুষ এক ও লা শরীক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের (দীন ও শরীয়ত) ভিত্তিতে তাঁর দাসত্ব করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির জন্যই কাজ করবেনা, বরং মহান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও পরলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাবে। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আদালতে আখিরাতে তাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং তার পরিণতিতে তাকে চিরকাল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নাম ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে এ সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে গেলে পরকালে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে বিরাট সম্মানজনক পুরস্কার জান্নাতুল ফেরদৌসের আলা মাকাম লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে তার মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করাকে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই মানুষ সত্যিকারভাবে ইবাদত ও খিলাফতের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আদর্শ মানুষে পরিণত হবে। আর এ উদ্দেশ্যেই তাকে মহান আল্লহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী: " আরেকটি মানব দল আছে যারা মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জান প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। মূলত, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রশীল" (সূরা আল বাকারা, ২: ২০৭)

মানুষদেরকে এভাবেই আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষানীতির মূল লক্ষ। কারণ এটাই মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ। কাজেই এ পথে জীবন পরিচালনা করে মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের একান্ত কর্তব্য।

৫। পূর্ণাঙ্গ জীবনভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষানীতি : মানবতার মুক্তি এবং কল্যাণের মুর্ত পথিক রাসূলে কারীম (সা)-এর শিক্ষা মানব জীবনের কোন একটি বা দুটি দিকের জন্য সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়। বরং তাঁর শিক্ষা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিব্যাপ্ত। আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈষয়িক ও বস্তুগত শিক্ষার প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। এই একমুখী বস্তুবাদী শিক্ষাই বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি অঙ্গনে বা প্রত্যেক দিকও বিভাগে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ। আসলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ভিত্তিক শিক্ষাই কেবল মানুষদেরকে মুক্তি দিতে পারে। ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চায়। তাই, ইসলামই প্রকৃতির ধর্ম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথীদের একই সাথে আত্মিক মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। এর একটিকে অপরটির থেকে আলাদা করে দেননি।

এতোধাভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন সুনিপুণভাবে। প্রত্যেকটি বিভাগের সামঞ্জস্যস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেননি তিনি। বরং একটি এককের অধিন করেছেন। মূলত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেননি তিনি। বরং একটি এককের অধীনে করেছেন। মূলত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের শতভাগ বিকশিত করতে পারলেই মানুষ আদর্শ মানুষে পরিণত হতে পারে। তাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে– 'পূর্ব এবং পশ্চিমে মুখ ফিরানো আসল পুণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত পুণ্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি আর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাবার আশায় নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করলো আত্মীয়, স্বজন এতিম, মিসকীন পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দানের জন্য। তাছাড়া সালাত কায়েম করলো এবং যাকাত পরিশোধ করলো আর এই পুণ্যবান লোকেরা হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং দারিদ্র দুঃসময়, দুঃখ দুর্দশা, বিপদ আপদ ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অটলতা অবলম্বনকারী। এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী আর এরাই ন্যায়বান আদর্শ মানুষ।' (সূরা আল বাকারা , ২: ১৭৭)

রাসূলে মাকবুল (সা) তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এরকম একটি সত্যপন্থী ন্যায়বান আদর্শ মানবগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। যাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী বিকশিত করে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ শিক্ষা মানুষদেরকে কেবল বৈষয়িক দিক থেকেই যোগ্য করেনা, পরকালীন সাফল্যও প্রদান করে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছাত্রগণ তাদের মনিবের দরবারে উভয় জগতের সাফল্য ও কল্যাণের জন্য ফরিয়াদ জানায়। যারা বলেন, 'হে আমাদের প্রভূ, আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও দান করো আর পরকালের কল্যাণও দান করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।' (সূরা আল বাকারা, ২:২০১)

বাস্তবিক পক্ষে এই শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গতার কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথীগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব দলে পরিণত হয়েছিলেন। তারপর থেকে যে যুগে, যে সময়ের লোকেরা যতটুকুন অনুসরণ করেছে তারাই ততটা বিশ্ববাসীর দরবারে উন্নত আদর্শের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। ♦

বিশ্বনবীর বিস্ময়কর মুজিযা

মো. আবুল কাসেম ভুইয়া

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) অনন্য ও অদ্বিতীয় প্রতিভার স্বর্ণিল-বর্ণিল প্রতীক। বস্তুত মহানবী (সা)-এর জীবন ও কর্মপ্রবাহের যেদিকে তাকাই সেদিকেই দিগন্ত বিস্তৃত অতুলনীয় হিরা-চুনি-পান্নার সমাহার। নবীজীর মুজিযার ব্যাপারেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

মুজিযা

মুজিযা নবী-রাসূলগণের প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ। এটি কেবল নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুজিযা আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরাভূতকারী। মুজিযার লক্ষ্য হচ্ছে নবী-রাসূলগণের দাবীর সত্যতাকে প্রমাণিত ও জোরদার করা। আসলে মুজিযা হলো আল্লাহতা'আলার অসীম কুদরতের এমন নিদর্শন যা বস্তুজগতে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক হাসান আইয়ূব বলেন- "নবী ও রাসূলদের নবুওয়াত ও রিসালাতের স্বপক্ষে স্বয়ং আল্লাহতা'আলার অকাট্য প্রমাণকে ইসলামী আকাঈদের পরিভাষায় মুজিযা বলা হয়।"

পরিভাষাগত অর্থে, মুজিযা হল এমনই অলৌকিক শক্তি যা কাফির বা অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং নবী রাসূলদের শান-শওকত ও মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সহায়ক। আল্লামা তাফতাযানী (র)-এর কথায়- "মুজিযা বলা হয়, নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সময় নবুওয়াতপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হতে এমন অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া যার মোকাবেলা করতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় অক্ষম।

মহান আল্লাহতা'আলা মুজিযার মাধ্যমে এটাই চাক্ষুষ প্রমাণ করতে চান যে, তিনি নিজেই সংশ্লিষ্ট নবী বা রাসূলকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি (আল্লাহ) মুজেযা প্রদর্শনে এও বুঝাতে চাচ্ছেন যে, নবী বা রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, আনুগত্য ও অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক।

বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণ প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, মুজিযা আল্লাহতা'আলার এমন সব অলৌকিক নিদর্শনক্ষমতা যা সমকালিন নবী ও রাসূলের হেদায়েত অস্বীকারকারীদের বিদ্রূপাত্মক ভূমিকার মোকাবেলায় নবী-রাসূলদের দেয়া হয়। নবুওয়াত অস্বীকারকারী বান্দারা নবী-রাসূলের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়।

এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, প্রাজ্ঞ গবেষক আল্লামা সোলায়মান নদভী (র) বলেন যে, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মুজিযা আল-কুরআনে ৪৫টি এবং আল-হাদিসে ১৫৫টি পাওয়া গেছে। শায়েখ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের মতে, মহানবী (সা)-এর মুজিযার সংখ্যা অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মুজিযাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর মুজিযার সংখ্যা ১০০০। কারো মতে ৩০০০। আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম" গ্রন্থের মতে, নবী করিম (সা)-এর মুজেযা ও অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা দশ-হাজারেরও বেশি। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যে এ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাজার হাজার বিস্ময়কর মুজিযা থেকে হাতে গোণা কিছু মুজিযা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

এক. নবী করিম (সা)-এর শ্রেষ্ঠ ও চিরন্তন মুজিযা আল-কুরআন। পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলকে এ ধরনের মুজিযা দেয়া হয়নি। আগেকার নবীদের মুজিযাগুলো এক বিশেষ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং সে সময় অতিক্রান্ত হবার পর এর কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের নবীজীর (সা) এই কুরআন তাঁর সময় যেমনটি ছিল আজও তেমনটি আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মিশরের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তক ও গবেষক অধ্যাপক হাসান আইয়ূব বলেন- "আল-কোরআন মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণের

শ্রেষ্ঠ মৌলিক মুজিযা। ..... আল কোরআন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার আবেদনশীল এক বিস্ময়কর চিরন্তন গ্রন্থ। আল-কুরআনের এ মুজিযা কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী। বিশ্বের কোন বাকপটু, সাহিত্যিক, পন্ডিত আল-কুরআনের সামান্য দক্ষতা ও যোগ্যতার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের সকল শক্তি কোরআনের সমকক্ষ কোন গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হবে না। আল-কুরআনের মুকাবিলায় সৃষ্টির এই অপারগতা ও অক্ষমতা চিরস্থায়ী। আল্লাহতা'আলা নিজেই এর হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্যান্য নবীদের কিতাবগুলোর হিফাজত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল কিন্তু ঐসব নবীদের সম্প্রদায় এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। দেখা গেছে, সেসব নবী-রাসূলদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকজন সময়ান্তরে তাদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবগুলোকে বিকৃত করে ফেলেছে। কয়েক বছর আগে জার্মানির খ্রিস্টান পাদ্রীরা বাইবেলের (ইঞ্জিল) প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো তুলনা করতে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যিশু খ্রিস্টের ভাষা ছিল আরামাইক। এ ভাষার মূল বাইবেলের অস্তিত্ব আর নেই। এখন প্রাচীন যে বাইবেল, তা গ্রীক ভাষার। গ্রীক বাইবেলই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তর হয়েছে। উক্ত পাদ্রীরা তাই মনস্থির করলেন যে, গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো যোগাড় করে এগুলোর একটির সাথে অন্যটির তুলনা করা হবে। সে লক্ষ্যে বিশ্বের সকল পান্ডুলিপি (সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ) সংগ্রহ করা হল। এ কার্যক্রম সমাপ্তির পর তারা এ মর্মে রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, প্রায় দুলক্ষ পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া গেছে। এরপর একটি বাক্য হলো– "এগুলোর আটভাগের মাত্র একভাগই গুরুত্বপূর্ণ।" অপরদিকে আল-কোরআনের সংরক্ষণ বিষয়টি ব্যতিক্রম। এর শব্দ ও বাক্যের বিন্যাসক্রম এতই শ্রুতিমধুর ও সাবলিল যে, যেকোন মানুষের পক্ষে তা মুখস্থ করে নেয়া সহজ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাফিজ বুকের মধ্যে সযতনে তা ধারণ করে রাখছে। আল-কোরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ কেউ (আসমানি হোক বা অ-আসমানি হোক) স্মৃতিতে হুবহু সংরক্ষণ করে রাখাতে সক্ষম হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন এর দরবারে বহু বিজ্ঞ ও পন্ডিতদের সমাগম হতো। একদিন তাঁর দরবারে এক ইহুদী পণ্ডিত আসলেন। এ ইহুদি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কিছু আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে খলিফা মামুন বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। জবাবে ইহুদি বলল, আমি পৈত্রিক ধর্মকে ত্যাগ করতে পারিনা। এ কথা বলে ইহুদি চলে গেল। এরপর থেকে এ ইহুদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি একজন নামকরা হস্তলিপিকারও ছিলেন। বিভিন্ন

গ্রন্থ স্বহস্তে লিখে চড়া দামে তিনি বিক্রি করতেন। পরীক্ষা করার লক্ষ্যে ইহুদি কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করে সুন্দর হস্তাক্ষরে তাওরাতের তিন কপি তৈরি করেন এবং ইহুদিদের উপাসনালয়ে বিক্রির জন্য উপস্থিত হন। সেখানকার ধর্মযাজক এগুলোকে সাদরে কিনে নেন। এরপর এ ইহুদি ইঞ্জিলেরও কিছু পরিবর্তন করে তিন কপি লেখে খ্রিস্টান পুরোহিতদের কাছে যান। তারাও তা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। সর্বশেষে আল-কোরআনের আয়াতের কিছু বেশ-কম করে তিন কপি লেখে মুসলমানদের কাছে যান। কিন্তু মুসলমানরা তা যাচাই-বাছাই করে এতে ভুল-ভ্রান্তি পায় এবং সেগুলো ফেরত দিয়ে দেয়। এ ঘটনায় ইহুদি নিশ্চিত হল যে, একমাত্র আল-কুরআনই হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং থাকবে। এই বিশ্বাসই তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করে।

বলাবাহুল্য অনেক সাম্প্রদায়িক অ-মুসলিম ব্যক্তিত্ব আল-কুরআনের ভুলভ্রান্তি অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের পূর্বোক্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর কিছু খ্রিস্টান পণ্ডিত হয়ত কুরআনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে জার্মানির মিউনিখ ইউনিভার্সিটিতে ইনস্টিটিউট ফর কুরানিক রিসার্চ স্থাপন করে। এ সংস্থার লক্ষ্য হল, কুরআনের সকল প্রাচীন পান্ডুলিপি বা ফটোকপি যোগাড় করা। তিন প্রজন্ম ব্যাপী এ সংগ্রহের কাজ চলে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ বলেন– ইংরেজি ১৯৩৩ সালে আমি যখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম সে সময় জার্মানির ওই ইনস্টিটিউটের তৃতীয় পরিচালক মি. প্রেটযল প্যারিসে এসেছিলেন কুরআনের পান্ডুলিপির জন্য। ..... তখন তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন, তাঁদের ইনস্টিটিউটে পবিত্র কুরআনের ৪৩ হাজার ফটোকপি আছে এবং আরো কপি সংগ্রহের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একটি বোমা ইনস্টিটিউট ভবনে আঘাত হানে। ফলে ভবনটির লাইব্রেরি ও স্টাফসহ ধ্বংস হয়ে যায়। ..... তবে তখন পর্যন্ত পরিচালিত পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে ..... কুরআনের পাঠে একটিও ভুল আবিষ্কার করা যায়নি।" তবে অনেক অনেক অ-মুসলিম প্রবোদ্ধা ও মনীষী আল-কুরআনের সত্যতা ও বিশুদ্ধতাকে অকপটে স্বীকার করে একে শ্রেষ্ঠতম মুজিযা হিসাবে সনাক্ত করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁদের দু'একজনের মন্তব্য নিম্নে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাসবেত্তা ফিলিপ কে. হিট্টি এর মতে- "কুরআন আল্লাহর কথা। কোরআনই আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ। ..... সমস্ত মুজিযার মধ্যে কোরআন শ্রেষ্ঠতম মুজিযা। সমস্ত মানুষ এবং জিন মিলিতভাবে চেষ্টা করেও এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে পারত না। ..... এর (কুরআন) শক্তির অনেকখানি নির্ভর করে অপূর্ব

ছন্দোময়ী ওজস্বিনী ভাষা-সম্পদের উপর।" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমালোচক টমাস কার্লাইল বলেন- "মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা এই কুরআনকে অত্যন্ত সম্মান করেন। সেই তুলনায় বাইবেলের প্রতি খুব কম সংখ্যক খ্রীস্টান সম্মান প্রদর্শন করে। ..... মুসলমানরা কুরআন পড়তে বাধ্য, তারা এর মধ্যে জীবনের আলো অন্বেষণ করে। মসজিদে প্রতিদিন কুরআন পড়া হয়। ত্রিশজন লোক একই সাথে বিভিন্ন অংশ পড়ে প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে। বারশ' বছর ধরে এই কুরআনের বাণী সবসময় অগণিত মানুষের কান ও হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছে (১৮৪০ সালে একথা বলা হয়)। আমরা এমন অনেক মুসলমানের কথা জানি যারা সত্তর হাজার বার এই পাঠ করেছেন। ..... কোরআনের কোন অংশ (সূরা) হাত থেকে সরিয়ে সুন্দরভাবে একটু দূরে রাখুন, দেখবেন তার সারবস্তু আপন প্রভায় উদ্ভাসিত হচ্ছে।"

আল-কুরআন যখন নাযিল হয় তখন আরবী সাহিত্য উৎকর্ষের চরম শিখরে উন্নীত। ভাষার সাবলিলতা, অলংকার ও রচনাশৈলীর নিগূঢ় ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব আরবদের আয়ত্বে ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আরবরা যেভাবে জানত তাঁর থেকে অনেক অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ বর্ণনাভঙ্গি, ছন্দায়িত ও শব্দযোজনে কুরআন নাযিল হল। আরবি ভাষার জাদরেল কবি ও পন্ডিতরা কুরআনের ভাষারীতি দেখে ও শুনে থ' খেয়ে গেল। অবিশ্বাসীরা যখন নবীজীকে (সা) অলৌকিক কোন কিছু প্রদর্শন করতে বলল, তখন তাদেরকে বলা হল, কুরআন নিজেই মিরাকল বা অলৌকিক। শুধু তাই নয়, কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেয়া হল- "এবং আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি যদি সন্দেহ কর, এর মত একটি সূরা বানাও।"

আল-জাহিজ (হিজরী ১৫৯-২৫৫) বলেন– "আরবরা যেভাবে পরিভাষা ব্যবহার করতো কুরআনে সেভাবে আসেনি। কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ বলেছেন আল্লাহ। আরবরা কবিতা সমগ্রকে বলতো দিওয়ানা। আল্লাহ কুরআনের অংশগুলোকে 'সূরা' বলেছেন, তারাতো কবিতার এক একটি একককে 'কাসিদাহ' বলতো। আল্লাহ সূরার একক অংশকে 'আয়াত বলেছেন, তারা তাদের কবিতা বা গদ্যের কাহিনীকে 'বায়ত' বলতো।" আল্লামা সুয়ূতী (হিজরী ৮৪৯-৯১১) পয়ত্রিশটি নানা প্রসঙ্গ এনে কুরআনের অদ্বিতীয়তা ও অনন্যতা স্বপ্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। আল জুরজানী (মৃত্যু ৪৭১ হিজরী) এবং আল কারিলানি (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরী) এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সাম্প্রতিককালে আল-রাফি (১৮৮১-১৯৩৭ খ্রি.) কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬ খি.) বিনত আসশাতি (১৯১৩-১৯৯৮ খ্রি.) প্রমুখ প্রাজ্ঞ ও খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। আল কুরআনের এ অভিনবত্ব দেখে ইসলামের চরম শত্রু উতবা ইবনে রাবিয়া

কুরআনের মোহময় ও মাধুর্যপূর্ণ সুর-লহরী শুনে বেইখতিয়ার বলে উঠলেন- "হে লোকসকল! তোমাদের ভালভাবে জানা আছে, আমি সবকিছু অধ্যয়ন করেছি, জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় আমার দখল আছে, প্রতিটি বিষয় ও শাস্ত্রেই পরীক্ষা করেছি, প্রত্যেক শাস্ত্রেই আমার জ্ঞান আছে, কিন্তু আল্লাহর শপথ! যে বাণী আজ শুনলাম, তা জীবনে কোনদিন শুনিনি, এতো কবিতা নয়, যাদুও নয়, আবার একে কোন গণকের উক্তিও বলা যায় না।"

হযরত আবু যর গিফারীর (রা)-এর ভাই আবু যরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি পবিত্র মক্কায় এমন একজন ব্যক্তির দেখা পাই, যে তোমার ধর্মাবলম্বী। সে বলল, আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সম্পর্কে লোকজন কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে? আনিস বললো, তারা তাঁকে যাদুকর, চারণ কবি ও গণক বলে অপবাদ দিচ্ছে। হযরত আবু যর বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার মতামত কী? আনিস নামজাদা কবি ছিলেন এবং জাহেলিয়াতের যুগে প্রতিযোগিতায় বারজন কবিকে পরাজিত করেছিলেন। আনিস বললেন, আমি গণকের কথা শুনেছি কিন্তু তার কথার সাথে গণকের কথার কোন মিল খুজে পাইনি। আমি খ্যাতিমান কবিদের কবিতার সাথে মিলিয়ে দেখেছি কিন্তু তাতো কবিতা বলে মনে হচ্ছেনা। আল্লাহর কসম, এ ব্যক্তির দাবি সত্য। এ কস্মিনকালেও কোন মানুষের তৈরি বাণী নয় বরং তাঁর বিরোধী অপবাদ প্রদানকারীরাই মিথ্যাবাদী।

ইদানিং কুরআনের আরেকটি বিষয়ের প্রতি গবেষকরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। সেটি হচ্ছে কুরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা। এ ব্যাপারে প্রায় একশ গবেষণাপত্র বিদ্যমান। কুরআন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানের উৎস ও তথ্য সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষকে শুধু অবহিতই করেনি, গবেষণা করারও নির্দেশ দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা ৭৫০। কুরআনের এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সত্য ও সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিম পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মুরিস বুকাইলির উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- "সারা কুরআনে আমি একটি ভুলও বের করতে পারিনি। আমি থেমে গেলাম এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কুরআনের রচয়িতা যদি কোন মানুষ হয়ে থাকেন, তবে তিনি কীভাবে সপ্তম শতাব্দীতে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন যা আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

আল-কুরআন অতীতের বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় ও সভ্যতার সঠিক ইতিহাস এবং পত্তন ও পতনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পর্যালোচনার বিবরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। এসব তথ্য সম্পৃক্ত কাহিনী ও ঘটনা এমন এক ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করেছেন যিনি কবি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং যিনি কারো কাছে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেননি। এই উম্মী নবীর (সা) দ্বারা এসবের বর্ণনা প্রদান কিভাবে সম্ভব? সন্দেহ নেই, আল্লাহর রাসূলের এসব তথ্য পরিবেশনের ভিত্তি ছিল ওহী বা প্রত্যাদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন।

আল-কুরআনের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি এমন সব অদৃশ্য জগতের রহস্যের বর্ণনা ও কিছু বিষয়ের বাণী দিয়েছে যার ভিত্তি প্রত্যাদেশ বা ওহী ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষে সম্ভব নয়। আল-কুরআন এর এসব ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, সূরা ফাতহের ২৭ নং আয়াতে নিরাপদে ও নির্ভয়ে মাথা মুড়িয়ে কিংবা চুল ব্যতীত অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশের ভবিষ্যতবাণী, সূরা রূমে দুই থেকে চার আয়াতে রোমকদের পরাজিত ও কিছুদিন পরে তাদের আবার বিজয়ের ভবিষ্যতবাণী ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ ও চিরন্তন করার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের অবদান অনস্বীকার্য। সেই সাথে কুরআন আলঙ্করিক উপস্থাপনাভঙ্গিও শিখিয়েছে। নতুন নতুন বাগধারা, জটিল ধ্যান-ধারণা, অর্থ ও যুক্তি পরিবেশনের নিমিত্তে একটি মডেল বা নমুনা প্রদান করেছে। এছাড়া নব নব শব্দ ও পরিভাষা বিনির্মাণ করে এবং অন্যভাষা থেকে শব্দ আত্মীকরণ করে আরবী ভাষাকে গতিশীল রাখার পদ্ধতি শিখিয়েছে। অন্যভাষার শব্দ আত্মীকরণ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতীর ব্যাখ্যা এই যে, এসব শব্দ এমন বিষয় আশয়, চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য আরবী ভাষার নিজস্ব কোন শব্দ অনুপস্থিত ছিল। আর্থার বাজেফেবি কুরআনের এ অভিনব পদ্ধতিকে স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন। ফলত আরবী মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়। শুধু তাই নয়, এটি বর্তমানে বিপুল সংখ্যক জনসমাজের মাঝে অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আরবী একটি উন্নত ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মানুষ মাতৃভাষা হিসাবে আরবীতে কথা বলে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা মোট ৬টির মধ্যে আরবী অন্যতম ভাষা। বিশ্বে এক বিলিয়নের বেশি মুসলমান আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে।

দুই. ইহুদিরা বিশ্বনবীর আগমনের তথ্য-উপাত্ত তাওরাত থেকে জেনেছে। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁর পিতা কোন বংশের হবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের আলোকে ইহুদিরা নবীজীর (সা) পিতা আবদুল্লাহকে সনাক্ত

করে। এটা তারা পছন্দ করেনি। তারা চেয়েছিল, শ্রেষ্ঠ ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ইসমাঈলের বংশধারাক্রম থেকে না এসে হযরত ইসহাকের উত্তরপুরুষ থেকে হোক। নবী করিম (সা) মাতৃগর্ভে আসার আগে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ কপালে একটি প্রোজ্জল নূর শোভা পেত। ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার জন্য নব্বইজন অস্ত্রধারী লোককে মক্কায় পাঠায়। একদিন আবদুল্লাহ মক্কার আশে-পাশের এলাকায় শিকার করতে যান। ওহাব (মা আমিনার পিতা) দূর থেকে লক্ষ্য করলেন যে, বেশ কিছু অস্ত্রধারী লোক আবদুল্লাহকে হত্যা করার জন্য ঘিরে ফেলেছে। ওহাব ও তার সঙ্গী-সাথীরা আবদুল্লাহকে বাঁচানোর জন্য দৌড়ে আসে। আল্লাহর কি মেহেরবানী! তারা পৌঁছার পূর্বেই আসমান থেকে বহু ঘোড়সওয়ার নেমে ঐ নব্বইজন আক্রমণকারীকে হত্যা করে। আবদুল্লাহর কপালের জ্যোতির্ময় নূরকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে থেকে দু'টি ঘটনা নিম্নে পেশ করা হল।

তিন. নবী করিম (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর দেহ ধুলা-বালিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমনি শরীর নিয়ে তিনি ইয়ালা আদভিয়া নাম্নী এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইয়ালা আবদুল্লাহর মোহময়ী কপাল ও চোখ দেখে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নিজের প্রতি আহ্বান জানাল। ঐ মহিলা প্রলোভনও দিল যে, যদি তিনি (আবদুল্লাহ) তার ডাকে সাড়া দেন, তাহলে সে একশ' উট প্রদান করবে। আবদুল্লাহ বললেন, আমি গোছল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসি। একথা বলেই তিনি স্ত্রী আমিনার কাছে গেলেন, সহবাস করলেন এবং নবীজী (সা) আমিনার গর্ভে চলে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইয়ালা আদভিয়ার কাছে গেলেন এবং বললেন– তুমি যে আমাকে আহবান জানিয়েছিলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত কী? ইয়ালা বলল, এখন আর না। আবদুল্লাহ বললেন– কেন না? সে বলল– আগে যখন এসেছিলে তখন তোমার কপালে একটি নূর প্রজ্জ্বলিত ছিল। আমেনার গর্ভে এটি চলে গেছে।

চার. তাওরাত ও ইঞ্জিলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ওরাকা বিন নওফেলের বোন কাতিলা। সে জ্যোতির্বিদ ছিল। একদিন আবদুল্লাহ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কাতিলা আবদুল্লাহর আঁচল ধরে তার দিকে আহবান জানাল। একটু পরে আসছি বলে তিনি চলে গেলেন। বাড়ি গিয়ে আবদুল্লাহ আমেনার সাথে সহবাস করলেন। এতে নবীজী (সা) আমিনার গর্ভে চলে গেলেন। এরপর তিনি অপেক্ষমাণ কাতিলার কাছে গিয়ে বললেন– তুমি যে সেসময় বলেছিলে সে সম্পর্কে এখন তোমার মতামত কী? আগে যখন তুমি যাচ্ছিলে তখন তোমার কপালে নূরের ঝলক শোভা পাচ্ছিল। এখন আর সে নূর দেখতে পাচ্ছিনা।

এ দুটি ঘটনায় একদিকে যেমন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মুজিযার প্রকাশ ঘটেছে অন্যদিকে তেমনি নবীজী (সা)-এর পরিবারের পবিত্রতা ও শূচিতা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– আমার বংশে সকলেরই বিবাহ হয়েছে এবং কোন ব্যাভিচার বা অপকর্ম হয়নি।

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের রাতে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে ভূমিকম্প হয়। এতে প্রাসাদের চৌদ্দটি গুম্বুজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। হাজার বছর ধরে অনির্বান থাকা পারস্যের মহা অগ্নিকুন্ড নিভে যায়। সাদা হ্রদের পানি শুকিয়ে যায়।

ছয়. এক রাতে ওরাকা বিন নওফেল, যায়েদ ইবনে আমর, ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশসহ কিছু কোরায়েশ নেতা একটি প্রতিমার পাশে জমায়েত হন। তারা লক্ষ্য করলেন যে, উপুড় হয়ে প্রতিমাটি মাটিতে পড়ে আছে। ব্যাপারটি তাদের কাছে খুবই খারাপ লাগল। এটিকে ধরে তারা সোজা করে দাঁড় করালো। কতক্ষণ পরে প্রতিমাটি সজোরে মাটিতে পড়ে গেল। আবার এটিকে উঠালো। তৃতীয় বারের মত এটি পড়ে গেল। শেষে ওসমান ইবনে হাওয়ায়রিস বলল– একটা কিছু ঘটেছে বলে মনে হয়। এ রাত্রটি ছিল নবী করিম (সা) এর জন্মের রাত্রি।

সাত. নবীজী (সা)-এর দুধ-মা হালিমা সাদিয়া বলেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর তিনি সাদ ইবনে বকরের কতিপয় মহিলার সাথে মক্কায় যান। তিনি গাধায় সওয়ার হয়েছিলেন। হালিমার সাথে তার স্বামী ও দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল। তার ছিল একটি বৃদ্ধ উষ্ট্রী। এটি একফোঁটা দুধও দিত না। হালিমার নিজের বুকেও দুধ না থাকায় শিশুটির খাবার নিয়েও তিনি চিন্তিত ছিলেন। শিশু মুহাম্মদ (সা) গরীব ও এতিম হবার কারণে হালিমার সঙ্গী-সাথী সব মহিলা তাঁকে দুধ খাওয়ানোর জন্য গ্রহণ করল না। আল্লাহর কি মহিমা, হালিমা ছাড়া সবাই পছন্দসই শিশু পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শিশু মুহাম্মদই (সা) হালিমার ভাগ্যে পড়লেন। শিশু মুহাম্মদকে (সা) কোলে নিয়ে তাঁবুতে পৌঁছার পূর্বেই হালিমার বুক দুধে ভরে গেল। নবী করিম (সা) ও তাঁর দুধ ভাই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন। ওদিকে হালিমার স্বামী বৃদ্ধ উষ্ট্রীর ওলান দুধে পরিপূর্ণ দেখে দুধ দোহন করলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন।

আট. আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ মাঠে উকবা ইবনে আবি মুইয়াতের মেষপালের রাখালিত্ব করছিলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবুবকর ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তার কাছে কিছু দুধ চাইলেন। আবদুল্লাহ বললেন যে, যেহেতু এই মেষপালের মালিক তিনি নন, সেহেতু তিনি

কাউকে দুধ দিতে পারেন না। এরপর নবীজী (সা) তাকে এমন একটি ভেড়ী দিতে বললেন, যে ভেড়ী তখনও দুধ দেয়ার উপযুক্ত হয়নি। আবদুল্লাহ নবীজীকে (সা) এ ধরনের একটি ভেড়ী দিলেন। নবী করিম (সা) এর বাটে ধরে দোয়া করলেন। মুহূর্তে ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হযরত আবু বকর একটি পাত্র আনলেন এবং নবীজী (সা) দুধ দোহন করলেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। এরপর বিশ্বনবী (সা) বাঁটের দিকে তাকালেন এবং শুকিয়ে যেতে বললেন। সাথে সাথে এটি শুকিয়ে যায়। এ মুজিযার কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ইসলামে দীক্ষিত হন।

নয়. বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নবীজীর (সা) এক ব্যতিক্রমী মুজিযা হল আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা। এক চাঁদনী রাতে মক্কার কিছু কাফের ও ইহুদি নবী করিম (সা)-এর কাছে এসে বলল যে, তিনি যদি চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরকে দেখাতে পারেন তাহলে তারা তাঁর নবুয়্যতের দাবি সত্য বলে মেনে নেবে। সে রাতটি ছিল পূর্ণিমার। নবীজী (সা) আল্লাহর হুকুমে আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং বলেন 'তোমরা স্বাক্ষী থাক।' কাফেররা এ ঘটনাকে যাদু বলে তড়িৎ গতিতে চলে গেল। বুখারী ও মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। বায়হাকী ও আবু নয়ীম হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন- "মক্কায় চাঁদ খণ্ডিত হয়ে দুভাগ হয়ে গেল। এটা দেখে মক্কার কাফেররা বলতে লাগল; ইবনে আবী কাবশা (হুজুর সা) তোমাদের উপর এ ধরনের যাদুই করে। তোমরা মূসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা কর। যদি তারাও তোমাদের মত চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখে থাকে, তবে এটা সত্য। নতুবা এটা যাদু, যা তোমাদের চোখে করা হয়েছে। তারা মূসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করল, যারা চতুর্দিক থেকে আগমন করেছিল। তারা বলল: আমরা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া দেখেছি।" আবু জাফর 'রাসূল মুহাম্মদ (সা)' গ্রন্থে হাজী মাহবুব কাশিমের 'Destruction or Peace' গ্রন্থের বরাতে বলেন যে, আবু জাহেল মক্কার কাছাকাছি শহর ও গ্রামে কিছুলোক পাঠায়। তারা খবরাখবর নিয়ে ফিরে এসে জানায় যে, ঐ সব শহর ও এলাকার লোকজন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবার বিষয়টি নিজেদের চোখে দেখেছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সে সময় মোনায় ছিলেন। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ছিল ছয় থেকে আট মাইল। তিনি এ ঘটনা নিজ চোখে দেখেন। এ ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং অন্য অঞ্চল থেকে যেসব ব্যবসায়ী মক্কায় আসে তারাও ঐ রাতে চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়া প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়া ভারতের মালওয়া মালভূমির চম্বল নদীর

নিকটবর্তী ধর রাজ্যের রাজা ভোজ এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীতে ভোজ রাজা মুসলমান হয়ে আবদুল্লাহ নাম ধারণ করেন।

দশ. মদিনায় হিজরতের সফরে নবী করিম (সা) উম্মে মা'বাদ খোয়ায়ার তাঁবুতে যাত্রা বিরতি করেন। এই মহিলা ধর্মপরায়না ও বুদ্ধিমতি ছিলেন। আতিথেয়তায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। বাড়ির আঙ্গিনায় বসে তিনি পথিকদের পানাহার করাতেন। নবীজী (সা) তাকে বললেন- তোমার কাছে খাবারের কোন কিছু আছে? মহিলা বললেন, আমার কাছে মেহমানদারী করার কোন কিছু থাকলে অবশ্যই তা করতাম। নবীজী (সা) বাড়ির পাশে একটি বকরি বাঁধা দেখলেন। এ বকরিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উম্মে মাবাদ বললেন- এ বকরিটি খুবই দুর্বল। হাঁটা-চলা করতে পারেনা বলে অন্য বকরিগুলোর সাথে চারণভূমিতে যেতে পারেনা। নবীজী (সা) বললেন-অনুমতি দিলে দুধ দোহন করি? উম্মে মা'বাদ বলল, যদি দুধ পান, দোহন করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বড় পাত্র নিয়ে ওলানে হাত স্পর্শ করলেন। অমনি ওলান দুধে ভরে গেল। দুধ দুহালেন। ওম্মে মা'বাদ সহ সবাই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন। পুনরায় দুধ দোহন করে পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে চলে গেলেন।

এগার. নবী করিম (সা) মক্কার বাইরে ছিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁকে রক্তাক্ত করেছে, ক্ষত-বিক্ষত করেছে। এমন সময় জিবরাঈল (আ) নবীজীর কাছে এলেন এবং বললেন, আপনি কি কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী? রাসূলুল্লাহ (সা) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি ঐ বৃক্ষটিকে আপনার কাছে আসতে ডাক দেন। নবী করীম (সা) ডাক দেয়া মাত্র বৃক্ষটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। জিবরাঈল (আ) বললেন, স্বস্থানে চলে যেতে একে বলুন। নবীজী (সা) তা-ই বললেন, অমনি বৃক্ষটি স্বস্থানে ফিরে গেল।

বার. নবী করিম (সা)-এর চাচা আবু তালিব একদিন রোগাক্রান্ত। নবীজী (সা) এ খবর শুনে তাঁকে দেখতে যান। আবু তালিব রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, ভাতিজা, তুমি যে রবের ইবাদত কর, সেই রবের কাছে আমার রোগমুক্তির জন্য দোয়া কর। নবীজী (সা) দোয়া করলেন। দোয়া শেষ হবার সাথে সাথে আবু তালিব সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তের. ওহুদের যুদ্ধের সময় কাতাদাহ ইবনে নোমানের চোখ মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। চোখ বের হয়ে গলার কাছে ঝুলছিল। নবীজী (সা) নিজে হাতে চোখটিকে যথাস্থানে রাখলেন। দেখা গেল, এই চোখ অপর চোখ অপেক্ষা অধিকতর সুস্থ ও উজ্জ্বল হল।

চৌদ্দ. খন্দকের যুদ্ধের সময় পরিখা খননকালে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার জন্য নবীজী (সা) পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। এ দৃশ্যটি দেখে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা)-এর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি নবীজীর (সা) অনুমতি নিয়ে বাড়ি আসলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন– তোমার কাছে কিছু খাবার জিনিস আছে? স্ত্রী বললেন– কিছু যব আর একটি ছাগল ছানা আছে। হযরত জাবের (রা) ছাগলছানাটিকে জবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী যব পিষলেন। গোশত হাড়িতে চড়ানো হল। এরপর হযরত জাবের নবীজীর (সা) কাছে গিয়ে বললেন– হুজুর, আমাদের বাড়িতে সামান্য কিছু খাদ্য আছে। আপনি দু'একজনকে নিয়ে চলুন। নবীজী (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– কী পরিমাণ খাবার আছে? হযরত জাবের তা বললেন। নবীজী (সা) খুশিতে বললেন– ভাল, খুব ভাল। তিনি আরও বললেন, তোমার স্ত্রীকে বলে দাও, আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে যেন হাড়ি না নামায় এবং রুটি বের না করে। আনসার ও মোহাজির সকল সাহাবীদের সাথে নিয়ে নবীজী (সা) হযরত জাবেরের (রা) বাড়ি গেলেন। নবী করিম (সা) রুটির টুকরা করলেন এবং এতে গোশত রাখলেন। রুটি-গোশত নেবার পর পরই হাড়ি ও পাত্র ঢেকে দিতেন। এভাবে রুটির টুকরা ও গোশত সাহাবাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। আরও রুটি ও গোশত রয়ে যায়। নবীজী (সা) এগুলো হযরত জাবেরের (রা) স্ত্রীকে দিয়ে বললেন– তুমি খাও, আশে পাশের লোকজনকে হাদিয়া দাও। তাদের মধ্যেও ক্ষুধার্ত থাকতে পারে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয় যে, এ খানায় মেহমানদের সংখ্যা ছিল ১০০০।

পনের. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, হুদায়বিয়া সন্ধির সময় সাহাবাগণ তৃষ্ণার্ত হলেন। তাঁরা নবীজীর (সা) কাছে আরজী পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পান ও ওযু করার জন্য আমাদের কাছে ততটুকু পানি আছে, যেটুকু পানি আপনার জগে (যা নবী করিম (সা) এর পাশে ছিল) আছে। নবীজী (সা) তখন নিজ জগে হাত ঢোকালেন। হুজুর পাক (সা)-এর আঙ্গুল থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহ সৃষ্টি হল। আমরা সবাই তৃপ্তির সাথে পানি পান ও ওযু করলাম। হযরত জাবিরকে (রা) প্রশ্ন করা হল, সেসময় আপনারা কজন উপস্থিত ছিলেন? এর জবাবে তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। তবে সংখ্যা এক লাখ হলেও পানির অভাব হতো না।

ষোল. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। এক সফরে আমরা নবীজীর (সা) সাথে ছিলাম। পথে সবার খাদ্য ফুরিয়ে গেল। অনন্যোপায় হয়ে লোকেরা নিজেদের উট যবাই করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে হযরত উমর (রা) নবীজীর (সা)

কাছে গেলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকদের কাছে যদি সামান্য কিছু খাদ্য থাকে তা আপনার সামনে রাখি। আপনি দোয়া করলে আল্লাহতা'আলা এতে বরকত দিতে পারেন। নবীজীর (সা) অনুমতিক্রমে যার যা আছে তা নবীজীর (সা) সামনে রাখা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করে খাদ্যদ্রব্যে ফুঁ দিলেন। সাথে সাথে খাদ্যদ্রব্যের পাত্রগুলো খাবারের বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

সতের. ইসলাম গ্রহণকালে আসহাবে সুফফার অন্যতম সাহাবী আবু হুরায়রার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল। নবী করিম (সা) হাদিস যখন বর্ণনা করতেন তখন তা হুবহু তাঁর স্মৃতিতে ধরে রাখতে অসুবিধা হতো। এ অসুবিধার কথা তিনি নবীজীকে (সা) বললেন। নবীজী (সা) তাঁকে বললেন, আবু হুরায়রা, তুমি তোমার চাদরটি মাটিতে ছড়িয়ে রাখ। আবু হুরায়রা সাথে সাথে তা করলেন। এরপর নবী করীম (সা) নিজ হাতে চাদরটি গুটিয়ে নিয়ে উঠালেন এবং দোয়া পড়ে চাদরে ফুঁ দিলেন। তারপর চাদরটিকে আবু হুরায়রার হাতে দিয়ে বললেন– এটিকে তোমার বুকে কিছু সময় চেপে ধরে রাখ। নবীজীর (সা) কথামতো তিনি কতক্ষন বুকে চাদরটিকে চেপে ধরে রাখলেন। এ ঘটনার পর থেকে হযরত আবু হুরায়রার স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে গেল। সেই থেকে তিনি নবীজীর (সা) কাছ থেকে যত হাদিস শুনেছেন তা আজীবন ভুলেননি। জীবদ্দশায় তিনি ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণনা করেন।

হযরত আবু হুরায়রার (রা) অসাধারণ ও অলৌকিক স্মরণশক্তির কথা শুনে উত্তরকালের মক্কা শরীফের গভর্নর মারওয়ান স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁকে ডাকলেন এবং কিছু হাদিস শুনাতে অনুরোধ করেন। এদিকে মারওয়ান তাঁর (হুরায়রা রা.) হাদিসগুলো পর্দার আড়ালে সংগোপনে লিখে রাখার জন্য সচিব যুহাইয়াকে নির্দেশ দেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) কয়েকশ হাদিস বর্ণনা করেন এবং সচিবও সেগুলো ক্রমানুসারে লিখে রাখেন। একবছর পর গভর্নর হযরত আবু হুরায়রাকে ডাকলেন এবং পূর্বে বর্ণিত হাদিসগুলো ক্রমানুসারে পুনরায় বর্ণনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এক বছর পূর্বে বর্ণিত হাদিসগুলো আগের ক্রমানুসারে ঠিক ঠিকই বলে ফেললেন। গভর্নর মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রখর স্মৃতি শক্তি দেখে বিশ্মিত হন এবং তাঁকে যথাযোগ্য তোহফা দিয়ে সসম্মানে বিদায় জানান।

আঠার. একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রা) দারুণ ক্ষুধায় কাতরাবস্থায় পথ অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকরের (রা) সাথে সাক্ষাৎ হয়। আতিথেয়তা পাবার আশায় আবু হুরায়রা (রা) আবু বকরের বাড়ি পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। আবু বকরের (রা) বাড়ি থেকে ফেরার পথে হযরত উমর

ফারুকের (রা) সাথে তাঁর দেখা হল। এবারও কিছু খাবার পাবার আশায় তিনি উমর ফারুকের (রা) বাড়ি পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু সেখানেও কিছু মিলল না। ফিরতি পথে নবী করিম (সা) বললেন– 'আবু হুরায়রা, তোমাকে খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। চল, আমার সাথে।' বাড়ি পৌঁছে নবীজী (সা) তাঁকে বললেন– 'ভেতরে যাও, কোন খাবার আছে কিনা দেখ।' ভেতরে গেলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে এক বাটি দুধ দিলেন। এ দুধ নবীজীর (সা) সামনে আনলে তিনি এতে ফুঁ দিলে বললেন– উপস্থিত সবাইকে পান করাও। আবু হুরায়রা উপস্থিত পনের/ষোল জন সাহাবীকে তৃপ্তির সাথে পান করালেন। এরপর হুজুর (সা) বললেন- আবু হুরায়রা, এখন তুমি পান কর।' আবু হুরায়রা (রা) পেটভরে পান করলেন। সবশেষে নবী করিম (সা) কিছু দুধ পান করলেন। এত লোকে পান করার পরও বাটিতে প্রথমে যে দুধ ছিল, সে পরিমাণ দুধ মওজুদ রয়ে গেল।

উনিশ. হযরত আসমা বিনতে ওমায়স (রা) বর্ণনা করেন। একবার নবীজীর (সা) উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল। তাঁর পবিত্র মাথা হযরত আলির (রা) কোলে। হযরত আলি (রা) তখনও আসরের নামায পড়েননি। এরই ফাঁকে সূর্য অস্তাচলে ডুবে গেল। নবীজী (সা) দোয়া করলেন- 'হে আল্লাহ! আলী তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে ব্যপৃত ছিল। অতএব তাঁর জন্যে সূর্যকে ফিরিয়ে আন।' আসমা (রা) বললেন, আমি দেখলাম, সূর্য অস্তমিত হল এবং তা আবার উদিত হল। তিবরানীর বর্ণনায় সূর্য উঠে পাহাড় ও পৃথিবীর উপর স্থির হয়ে গেল। হযরত আলি (রা) ওযু করে আসরের নামায আদায় করার পরপরই সূর্য চোখের আড়াল হয়ে গেল।

কুড়ি. আবু নঈম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, খয়বরের যুদ্ধে আমরা নবীজীর (সা) সাথে ছিলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে আমাকে বললেন– আবদুল্লাহ আড়াল করার কোন বস্তু দেখা যায় কিনা, খোঁজ করতো। আমি একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়ে নবীজীকে (সা) জানালাম। তিনি বললেন– অন্য কোনকিছু আছে কিনা দেখ। আমি বেশ একটু দূরে আরেকটি বৃক্ষ দেখলাম। নবীজী (সা) বললেন– এ দুটি বৃক্ষকে বল, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে তোমরা একত্র হয়ে যাও। আমি একথা বলার সাথে সাথে উভয় বৃক্ষ পরস্পর মিলে গেল। নবীজী (সা) প্রয়োজন শেষ করে প্রস্থান করলেন। বৃক্ষ দুটি নিজ নিজ স্থানে চলে গেল।

একুশ. নবী করিম (সা)-এর খাতিরে (এক বর্ণনা মতে) তাঁর আব্বা-আম্মাকে কবর থেকে জীবিত উঠানো হয়েছে এবং উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন।

রাসূলুল্লাহকে (সা) এমন কিছু বিশেষ মুজিযা দেয়া হয়েছে, যা অন্যান্য নবীদেরকে প্রদত্ত হয়নি। এ প্রসঙ্গে শায়েখ জালালউদ্দীন সুয়ূতী বলেন- "সকল পয়গম্বরকে যত মুজিযা দেয়া হয়েছে, সেগুলো সব একা তাঁর (নবী করিম সা) সত্তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্য কোন নবীর মধ্যে তা হয়নি।" শায়েখ ইযযুদ্দীন পাথরের সালাম করা এবং খর্জুর শাখার ফরিয়াদ করাকে নবীজীর (সা) সবিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করে বলেন যে, কোন নবী-রাসূল এ ধরনের মুজিযা প্রাপ্ত হননি। ♦

তথ্য নির্দেশ:

১. শারহুল আকাইদিন নাসাফ, পৃ: ১২৪। দেখুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ: ৭৩।
২. উদ্ধৃত, অধ্যাপক হাসান আইয়ূব: ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৭১।
৩. উদ্ধৃত, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ: ৭১।
৪. দেখুন, অধ্যাপক হাসান আইয়ূব: ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৭২।
৫. দেখুন, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন: রাসূলুল্লাহ (সা)- যার তুলনা তিনি নিজেই (প্রবন্ধ), ঈদে মিলাদুন্নবী স্মরণিকা, ১৪৩২ হি. ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
৬. দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) খাসায়েসুল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃ: ২০৯।
৭. উদ্ধৃত, অধ্যাপক হাসান আইয়ূব: ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৮৫।
৮. সূরা হিজর: ৯।
৯. উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ: দি ইমারজেন্স অব ইসলাম, পৃ: ৯৫।
১০. দেখুন, মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃ: ৭২৬।
১১. উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ: দি ইমারজেন্স অব ইসলাম, পৃ: ৯৫।
১২. ফিলিপ কে. হিট্টি: আরব জাতির ইতিহাস, পৃ: ২৩-৩৬।
১৩. টমাস কার্লাইল: বীর এবং বীর বন্দনা, পৃ: ৭০-৭৩।
১৪. আল কুরআন, ২:৩।
১৫. উদ্ধৃত, ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল: কোরআন আরবী ভাষার জন্য আশীর্বাদ (প্রবন্ধ), মজলিস সংবাদ, ডিসেম্বর ২০১৫।
১৬. দেখুন, প্রাগুক্ত।
১৭. উদ্ধৃত, অধ্যাপক হাসান আইয়ূব: ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৯১।
১৮. মুসলিম শরীফ, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত গন্থ, পৃ: ১৯১-১৯২।
১৯. দেখুন ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল: কোরআন আরবী ভাষার জন্য আশীর্বাদ (প্রবন্ধ), মজলিস সংবাদ, ডিসেম্বর ২০১৫।
২০. মুরিস বুকাইলী: বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান।
২১. দেখুন, অধ্যাপক হাসান আইয়ূব: ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৯২।
২২. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।
২৩. ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল: কোরআন আরবী ভাষার জন্য আশীর্বাদ (প্রবন্ধ), মজলিস সংবাদ, ডিসেম্বর ২০১৫।

২৪. দেখুন, প্রাগুক্ত। আল্লামা সুয়ূতী: আল ইতকান, ১ম খন্ড, পৃ: ১৩৭।
২৫. দেখুন, প্রাগুক্ত।
২৬. দেখুন, হাজী মাহবুব কাশিম: DESTRUCTION OR PEACE. আরো দেখুন, আবু জাফর: রসূল মুহাম্মদ (সা), পৃ: ১২।
২৭. আবু নয়ীম ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত। দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র): খাসায়েসুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃ: ৭৮।
২৮. ইবনে সাদ ও ইবনে আসাকির ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন। দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র): খাসায়েসূল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃ: ৮১।
২৯. দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃ: ৭২।
৩০. বায়হাকী, আবু নয়ীম খারায়েজী ও ইবনে আসাকির আবু ইয়ালা ইবনে এমরান বাজালী থেকে, তিনি মাখযুম ইবনে সানী থেকে এবং তিনি নিজের পিতা থেকে (যার বয়স ছিল ১৫০ বছর) বর্ণনা করেন। দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী: খাসায়েসূল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃ: ৯৭।
৩১. খারায়েতী ও ইবনে আসাকীর ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন। দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) খাসায়েসুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃ: ৯৮।
৩২. ইবনে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি, আবু ইয়ালা, তিবরানী, বায়হাকী, আবু নয়ীম ও ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালেব থেকে হযরত হালিম বিনতে হারেসের উক্তি বর্ণনা করেন। দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র): খাসায়েসুল কুবরা, পৃ: ১০১-১০২।
৩৩. দেখুন, আবু জাফর: রাসূল মুহাম্মদ (সা) পৃ: ৩৫।
৩৪. দেখুন, প্রাগুক্ত।
৩৫. দেখুন, আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী: আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ১৬৯।
৩৬. দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র): খাসায়েসুল কুবরা, পৃ: ২২৩।
৩৭. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৯-২৩০।
৩৮. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১২।
৩৯. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩১।
৪০. দেখুন, অধ্যাপক হাসান আইয়ূব: ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৮২-১৮৩।
৪১. দেখুন প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।
৪২. দেখুন কাজী খলিলুর রহমান: রহমতুল্লিল আলামীন (সা), পৃ: ৩৮২-৩৮৩।
৪৩. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮৩-২৮৪।
৪৪. দেখুন, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র): খাসায়েসুল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃ: ১০৬।
৪৫. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮০।
৪৬. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৫।
৪৭. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৯।
৪৮. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৯।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবির আগমন সংবাদ

মো. আবদুন নূর

আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিলের পূর্বে যত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, প্রত্যেক কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিল শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী এবং উনার শুভাগমনের ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে সুস্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত ছিল। ফলে ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে পূর্বাহ্নেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের কথা সম্যক রূপে অবগত ছিলেন। হযরত ঈসা (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শুভাগমন সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ঐ সময়টিও স্মরণীয়

যখন মারইয়াম (আ)-এর পুত্র হযরত ঈসা (আ) বলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সংবাদ বাহক) রূপে আগমন করেছি, আমার পূর্বে যে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল, আমি তার সত্যতার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমদ নামক যে একজন রাসূল আগমন করিবেন, আমি তার সুসংবাদ দাতারূপে আগমন করেছি।" (সূরা সফ, আয়াত-০৬) ।

তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল-সাধারণভাবে বাইবেল নামে পরিচিত। বাইবেলের দুটো খণ্ড, একটির নাম– বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (The Old Testament) অন্যটির নাম– নতুন নিয়ম (The New Testament)। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ছোট-বড় অনেকগুলো কিতাবের সমাহার এবং এর মধ্যে রয়েছে তাওরাত ও যাবুর কিতাব। আর বাইবেল নতুন নিয়ম হচ্ছে হযরত ঈসা (আ) এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল কিতাব। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল কিতাবে সুসমাচার নামে চারটি অংশ আছে। এগুলো মানব রচিত। এগুলো হলো– (১) মথি লিখিত সুসমাচার (২) লুক লিখিত সুসমাচার (৩) মার্ক লিখিত সুসমাচার (৪) যোহন লিখিত সুসমাচার।

যোহন লিখিত সুসমাচার খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল শরীফের চতুর্থ খন্ড। এটি অন্য তিনটি সুসমাচার হতে ভিন্ন। যোহন হচ্ছে জেবেদীর ছেলে। যখন যীশু খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেন, তখন যোহনের বয়স কম থাকা সত্ত্বেও ইউকেরিস্ট বা প্রভুর ভোজ পর্ব অনুষ্ঠানে যীশুর পাশেই যোহন বসেছিলেন। খৃস্টান জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত 'লাস্ট সাপার' নামক চিত্রকর্মটিতে দেখা যায় যোহন যীশুর পাশেই বসে রয়েছে।

যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ হতে ১৭ পর্যন্ত মোট চারটি অধ্যায়ে যীশুর শেষ কথোপকথনগুলো লিপিবদ্ধ আছে। শেষ বিদায়ের এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে যীশু যে আধ্যাত্মিক বক্তব্য রেখে গেছেন– মথি, মার্ক ও লুক এর লিখিত সুসমাচার তিনটিতে তা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। তৎসংক্রান্ত বর্ণনা উপস্থিত থাকার কারণ যেমন রহস্যময়, তেমনি দুর্বোধ্য বটে। নিম্নের আলোচনায় এর কারণ কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে– যোহনের লিখিত সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৭ এই চার অধ্যায়ব্যাপী বর্ণনা করা হয়েছে, "তিনি চলে গেলে মানুষকে সুপথ ও ধর্মের পথে পরিচালিত করার জন্য আরেকজন নবীকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনি চিরকাল তাদের সঙ্গে থাকবেন অর্থাৎ এর পর কোন নবী আসবেন না। তিনিই হবেন শেষ নবী।"

বাইবেলের নতুন নিয়ম যোহন সুসমাচারে উল্লেখ আছে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছেন–

(১) "*If you love me, you will keep my Commandments, And I will pray the Father, and he will give you another Paraclete*" (14:15-16). যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা-সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার (আল্লাহ) নিকট আবেদন করিব, তিনি আরেক পরাক্লীত বা সহায়-সমর্থনকারী তোমাদিগকে দান করিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। (ইঞ্জিল, যোহন; অধ্যায়ঃ ১৪, শ্লোকঃ ১৫-১৬)

(২) "*But the Paraclete, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all that I have said to you*" (14:26). উক্ত ইঞ্জিলে আরো উল্লেখ আছে, যাহাকে আমি পিতার (আল্লাহর) নিকট হইতে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব, সেই সহায়, পবিত্র আত্মা সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। (ইঞ্জিল, যোহন-অধ্যায়ঃ ১৪, শ্লোকঃ ২৬) ।

(৩) "*He will bear witness to me*" (15:26). সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবেন, 'তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।' (ইঞ্জিল-যোহন-অধ্যায়ঃ ১৫, শ্লোকঃ ২৬)।

(৪) "*It is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Paraclete will not come to you; but if I go, I will send him to you, And when he comes, He will convince the world of sin and of righteousness and of judgement*…(16:7-8). আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পৃথিবীর পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগতকে সচেতন করিবেন। (ইঞ্জিল-যোহন-অধ্যায়ঃ১৬, শ্লোকঃ ৭-৮) ।

(৫) "*When the spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak and he will declare to you the things that are not come. He will glorify me…* (16:13-14). 'তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পারিবেনা। পরন্ত সেই সত্যের আত্মা (পরাক্লীত) যখন আসিবে তখন তিনি তোমাদিগকে সত্যের সন্ধান দিবেন কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।' (ইঞ্জিল, যোহন, অধ্যায়ঃ ১৬, শ্লোকঃ ১৩-১৪) ।

ইঞ্জিলে বর্ণিত এই শ্লোক গুলিতে হযরত ঈসা (আ) বারবার যে পয়গম্বর এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁকে পরাক্লীত (Paraclate) শব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। ডাক্তার মরিস বুকাইলি তার লিখিত 'The Bible, The Quran and Science' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'Jesus last dialogues. The paraclete of John's Gospel'নামক অধ্যায়ে পরাক্লীত শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। পাঠকদের সদয় জ্ঞাতার্থে তা (মূলগ্রন্থ) থেকে অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

According to John, when Jesus says (14:16) "And I will pray the Father, and he will give you another 'Paraclete', what he is saying is that another intercessor will be send to man, as he himself was at God's side on man's behalf during his earthly life." যোহন সুসমাচার মতে যীশু যখন বললেন (ইঞ্জিল, যোহন, অধ্যায়ঃ ১৪, শ্লোকঃ ১৬), "এবং আমি পিতার নিকট নিবেদন করবো এবং তিনি অন্য একজন সহায় (পরাক্লীত) তোমাদিগকে দিবেন।" তিনি (যীশু) বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি নিজে আল্লাহর পক্ষ হতে যেমন তাঁর পার্থিবজীবনে মানুষের নিকট হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে আর একজন পরাক্লীত বা সহায় বা মধ্যস্থতাকারীকে (আল্লাহপাকের পক্ষ হতে) মানব জাতির নিকট প্রেরণ করা হবে।

ডা. মরিস বুকাইলি আরো বলেন, "John's 'Paraclete' a human being like Jesus, Possessing the faculties of hearing and speech formally implied in John's Greek text. Jesus therefore Predicts that God will later send a human being to Earth to take up the role defined by John, i.e., to be a Prophet who hears God's word and repeats his message to man. This is the logical interpretation of John's texts arrived at if one attributes to the word's their proper meanings." যোহনের গ্রীক ভাষায় রচিত মূল সুসমাচারে যিশুখ্রিস্টের মুখনিঃসৃত যে পরাক্লীত-এর কথা বলা হয়েছে, সেই পরাক্লীত যিশুখ্রিস্টের মতোই একজন রক্তমাংসের মানুষ, যিনি তাঁর শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা শুনতে পাবেন এবং ধ্বনি উচ্চারণ দ্বারা কথা বলতে পারবেন। অর্থাৎ সেই পরাক্লীত-এর থাকবে বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি। সুতরাং, এর দ্বারা যীশুখ্রিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, পরবর্তীকালে তাঁরই ভূমিকা পালনের জন্য আল্লাহপাক আর একজন মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করিবেন। যোহনের বর্ণনামতে, "সেই প্রেরিত পুরুষটি হবেন একজন নবী বা রাসূল; যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত, 'আল্লাহর বাণী' মানুষের নিকট পৌঁছে দিবেন। যুক্তিবিজ্ঞানের নিরিখে যোহনের সুসমাচারে বর্ণিত শব্দাবলির সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা এটাই দাঁড়ায়।" পরবর্তীকালে Holy Spirit দুটো শব্দ একান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে কেন জুড়ে দেয়া হয়েছে এই মর্মে

ডা. মরিস বুকাইলি বলেন, "The presence of the term, 'Holy Spirit' in today's text could easily have come from a later addition made quite deliberately. It may have intended to change the original meaning which predicted the advent of a Prophet subsequent to Jesus and was therefore in contradiction with the teachings of the Christian churches at the time of their formation; These teachings maintained that Jesus was the last of the Prophet." "বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল (ইঞ্জিল শরীফে) 'হোলি স্পিরিট' তথা পবিত্র আত্মা বলে যে কথাটি পাচ্ছি, নিঃসন্দেহে তা পরবর্তীকালে একান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংযোজন করা হয়েছে। যিশুখ্রিস্টের তিরোধানের পর আরেকজন পয়গম্বর বা নবীর আগমনের কথা মূল বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা পুরোপুরিভাবে ধামাচাপা দেয়ার অভিপ্রায়েই সম্ভবত তা করা হয়েছে। খ্রিস্টান গির্জা সমূহে প্রচার করছে যে, যীশুখ্রিষ্টই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী।" গির্জা সংস্থার এই প্রচার যাতে মাঠে মারা না যায়, সেইজন্যই বাইবেলের বাণীতে ও অনুবাদে এধরনের কারসাজি ও বিকৃতি করা হয়েছে। এর কারণ প্রসঙ্গে ডাক্তার মরিস বুকাইলি বলেন, "Judaism does not However admit any revelation subsequent to its own, Christianity takes no account of any revelation subsequent to Jesus and his Apostles. It therefore rules out the Qur'an." "নিজস্ব হিব্রু বাইবেলের পরে আর কোন ওহিপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থের কথা ইয়াহুদিরা বিশ্বাস করে না এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ) ও তার সাহায্যকারী ব্যতীত আর কোন ওহির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সে কারণে পবিত্র কুরআন তাদের কাছে 'বাতিল' বলে গণ্য।"

ইঞ্জিলে বর্ণিত এই শ্লোকগুলিতে (যীশু) হযরত ঈসা (আ) বার বার পরবর্তীতে আর ও একজন পয়গম্বরের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি তাঁকে (হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পরাক্লীত শব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। Paraclete (পরাক্লীত) শব্দটি 'ইবরানী' অথবা 'সুরইয়ানী'। এই শব্দটির হুবহু আরবি অনুবাদ "মুহাম্মদ" এবং "আহমদ" অর্থাৎ, প্রশংসিত, পরম প্রশংসাকারী অথবা পরম প্রশংসিত।

প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এই শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'পাইরিকিল ইউটাস'-এর অর্থ ও 'অত্যন্ত প্রশংসাকারী' বা 'প্রশংসিত'। এই পরাক্লীত শব্দটি হযরত ঈসা (আ)-এর মুখ নিঃসৃত। আর তাঁর এই ভাষা ছিল 'সুরিয়ানী মিশ্রিত ইবরানী' কিন্তু তাঁর (হযরত ঈসা (আ))-এর ভাষা গ্রীক ছিল না। পরবর্তীতে খ্রিষ্টানগণ যখন দেখতে পেল যে, এর দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রতিপাদিত বা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন তারা শব্দটি সামান্য পরিবর্তন করে 'পাইরিকিলিটাস' অর্থাৎ শান্তিদাতা বা সহায় বানিয়ে দিল।

যোহনের লিখিত ইঞ্জিলে প্রতীক্ষিত আগমনকারী রাসুলের যে লক্ষণ ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এর ব্যাখ্যা হলো:

(১) হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা লোকেরা ভুলে যাবে। প্রতিশ্রুত আগমনকারী রাসূল বা নবী এসে তা স্মরণ করিয়ে দিবেন। খ্রিষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র', তাঁর প্রতিমূর্তির পূজা এবং তাঁকে আল্লাহর এক তৃতীয়াংশ (১/৩) বলে বিশ্বাস করত। এই সমস্ত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডন করে হযরত ঈসার (আ) প্রকৃত মতবাদ বা শিক্ষা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(২) "হযরত ঈসা (আ)-এর অসমাপ্ত/ অসম্পূর্ণ বিষয় ও কাজগুলি আগমনকারী নবী পূর্ণ করবেন এবং সত্যের সন্ধান দিবেন।" হযরত ঈসা (আ)-এর সময় পর্যন্ত আল্লাহর পবিত্র দ্বীন অসম্পূর্ণ ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বারাই পবিত্র দ্বীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি আকিদা, ইবাদত, চরিত্র, শরীয়তের বিধি-বিধান, কিয়ামতের নির্দেশনাবলি, বেহেশত-দোজখ, সওয়াব, আজাব প্রভৃতি বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন; যা অন্য কোন নবী-রাসূল দেন নাই। এ জন্যই হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে খাতামুন্নাবীঈন বা সর্বশেষ নবী উপাধি দেয়া হয়েছে।

(৩) হযরত ঈসা (আ) বলেছিলেন, "তিনি (আগমনকারী নবী) আমার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।" এই কথাগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় প্রযোজ্য। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করেছিলেন এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জীবিত বা মৃত হওয়া সম্পর্কীয় বিষয়ে পূর্ণ মীমাংসা তিনিই (হযরত মুহাম্মদ (সা)) করেছেন। ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম এর প্রতি অপবাদের যে কলঙ্ক আরোপ করেছিল, তাহাও হযরত মুহাম্মদ (সা) খণ্ডন করে হযরত মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত দীপ্তিময় উজ্জ্বল রূপ দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন।

(৪) প্রতীক্ষিত/আগমনী নবীর অপর নিদর্শন সম্পর্কে হযরত যীশু (ঈসা (আ)) বলেছেন, "তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলবেন না বরং আল্লাহর পক্ষ হতে যা আদেশ হবে তিনি শুধু তা-ই বলবেন।" ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কিছুই বলেন না, বরং তাঁর প্রতি ওহীরূপে যাহা প্রেরিত হয়, শুধু তিনি তা-ই বলেন।" (সূরা নাজম, আয়াতঃ ০৩-০৪)

হযরত মুহাম্মদ (সা) যা কিছু বলতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তা লিখে রাখতেন। লোকেরা তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে) বললেন,

"আল্লাহর রাসূল (সা) কোন সময় রাগান্বিত হলে অনেক কিছু বলেন বা বলতে পারেন, তা যেন না লিখেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বিষয়টি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে জানালে তিনি নিজের পবিত্র মুখের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, "ইহা হইতে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতেই হক ও সত্যকথা ব্যতীত অন্য কিছু বাহির হয় না।" (সুনানে আবু দাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮)।

আল্লাহপাক হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কিতাবেই যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইহুদী-খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই এই সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন, "যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মে নবী, যার উল্লেখ তারা তাদের নিকট তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পেয়েছেন।" (সূরাতুল আরাফঃ ১৫৭) ।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যেসব গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য তাওরাত এবং ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ ছিল, যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন, তাদের কেউ কেউ নিজে তা শুনে, পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যেমন, কোন এক ইহুদী বালক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খেদমত করতো। হঠাৎ সে বালক অসুস্থ হয়ে পড়লো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন ইহুদী বালকের পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তেলাওয়াত করছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, "হে ইহুদী! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সেই মহান সত্ত্বার, যিনি মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আমার আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পেয়েছো?" সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার পিতা ভুল বলেছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা ও আপনার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল।" অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন যে, 'এখন এ বালক মুসলিম। তার মৃত্যুর পর তার দাফন কাফন মুসলিমরা করবে। তার পিতার হাতে দেয়া হবে না।' (মুসনাদে আহমদঃ ৫/১১) ।

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এক ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল (সা) এর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, যা সে মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাওরাতে দেখেছেন। তিনি বলেন, "আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এই কথাগুলো পড়েছি, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন তাই'বার দিকে। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও

বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোল করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে দূরে থাকবেন" (মুস্তাদরাকঃ ২/৬৭৮ হাদিসঃ ৪২৪২)।

কা'আবে আহবার বলেছেন, "তাওরাতে রাসূল (সা) সম্পর্কে লেখা রয়েছে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাই বা হাট-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা গ্রহণ করিবেন না; বরং ক্ষমা করে দিবেন এবং ছেড়ে দিবেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায় আর হিজরত হবে তা'ইবায়। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন' অর্থাৎ, আনন্দ-বেদনায় উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতাকারী। তারা যেকোন উর্ধ্বারোহণকালে তাকবীর বলেন। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, যাতে সময় নির্ণয় করে যথা সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে লুঙ্গি পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাদের আযানদাতা আকাশের সুউচ্চস্বরে আহবান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে, যেমন সালাত আদায় করার সময় হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে যেন মধুমক্ষিকার শব্দ। (সুনানে দারেমীঃ ৫, ৮, ৯)।

ইবনে সা'আদ রাহিমাহুল্লাহ সাহাল মাওলা খাইসামা (রা) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন, সাহাল (রা) বলেন, "আমি নিজেই ইঞ্জিলে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহ পড়েছি যে, তিনি খুব বেটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশগুচ্ছধারী হবেন। তাঁর দু'কাধের মধ্যস্থলে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজেই দোহন করবেন। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হবেন। তাঁর নাম হবে আহম্মাদ।" (তাবাকাত ইবন সা'আদঃ ১/৩৬৩)

ইঞ্জিলে আছে, "আল্লাহ নূর তুরে সায়না হইতে আসিল, সা'ঈর পর্বতে প্রকাশিত হইল এবং ফারান অর্থাৎ মক্কা নগরীতে বিকীর্ণ হইল।"

তাওরাতে আছে, আল্লাহর মনোনীত মহাপুরুষ হযরত মূসা (আ) মৃত্যুর পূর্বে যেই বরকতময় অসিয়ত দান করেছিলেন তা এই, "আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় হযরত মূসা (আ) কর্তৃক সা'য়না পর্বত হইতে আসিল, হযরত ঈসা (আ) সা'ঈর পর্বত হইতে উদিত হইল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক ফারান পর্বত হইতে বিকীর্ণ হইল; দশ হাজার পবিত্র সহচর সঙ্গে লইয়া আসিলেন, তাঁহাদের জন্য তাঁর ডান হাতে অগ্নিবৎ শরী'য়ত (আল্লাহ প্রদত্ত কঠোর শাসনতন্ত্র) আছে। কিন্তু তিনি আপন লোকদিগকে বড় ভালোবাসেন।" (তাওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায়ঃ ৩৩, শ্লোকঃ ১-৩)। ইহা ছিল হযরত মূসা (আ)-এর শেষ অসিয়্যত এবং

তাওরাতের শেষ বাণী। এই বাণীতে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত শা'য়খ আলী ইবন বুরহানউদ্দীন আলহলবী বলেন, "এই বাণীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) হযরত ঈসা (আ) এবং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ) তুরে সায়না পর্বতে নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁর উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) সা'ঈর পর্বতে নাসেরত শহরে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল আর হযরত মুহাম্মদ (সা) ফারানে অর্থাৎ মক্কা নগরীতে হেরা পর্বতের গুহায় নবুওয়ত প্রাপ্ত হন এবং তথায়ই তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়।" (আসসীরাতুল হলবিয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭)। এই সম্পর্কে হযরত আল্লামা সায়িদ সুলাইমান নাদবী বলেন, "এই ভবিষ্যত বানীতে সায়না, সা'ঈর এবং ফারান এই তিনটি পর্বতকে আল্লাহ প্রকাশস্থল বলা হয়েছে। বস্তুত এই পর্বতত্রয় নবুওয়াত সূর্যের তিনটি উদয়স্থল। হযরত মূসা (আ) সায়না পর্বতে, হযরত ঈসা (আ) সা'ঈর পর্বতে এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) ফারান পর্বত অর্থাৎ মক্কার পাহাড়ে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন।" (সিরাতুন্নবী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮২৪)। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের 'সূরা আত-তীনে' তাওরাতের এই সুসংবাদের পুনরুক্তি করেছেন, "কসম ডুমুর/ আনজীর ও যায়তুন ফলের এবং সিনীনে (অবস্থিত) তুর পাহাড়ের এবং এই (শান্তিপূর্ণ) নিরাপদ শহরের।" প্যালেস্টাইন আনজীর ও যায়তুন ফলের দেশ। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান ও তাঁর নবুওয়াতের লীলাভূমি; প্যালেস্টাইনের সা'ঈর পর্বতে তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তুরে সায়না, হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াত ও কিতাব প্রাপ্তিস্থান। আর এই শান্তিময় মক্কানগরী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মভূমি ও নবুওয়াত প্রাপ্তের স্থান। পবিত্র কোরআন প্রথমে এখানে (হেরা পর্বতের গুহায়) তাঁর উপর প্রথম নাযিল হয়েছিল এবং দশ হাজার সাহাবা নিয়ে মক্কা জয় করেন। (সীরাতে হলবী, পৃষ্ঠা- ২৩৭)।

তাওরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শুভাগমনের বহু ভবিষ্যৎবাণী ছিল। হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর তিরোধানের পর হতে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জিলে বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "অভিসম্পাত তাহাদের উপর যাহারা নিজ হাতে কিতাব লিখে লয় (অর্থাৎ, যাহারা নিজ হাতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের শব্দ অর্থাৎ আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে তাহাদের উপর অভিসম্পাত); অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে যে, এই হুকুম আল্লাহর

তরফ হইতে এইরূপেই আসিয়াছে (ইহাতে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব স্বার্থোদ্ধার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য)।" (সূরা-বাকারাঃ আয়াত-৭৯)

এই পরিবর্তন, বিকৃতির অন্যতম কারণ ইসলামের সত্যতা যেন প্রমাণিত না হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদী-খ্রিস্টান আলেম-পণ্ডিতগণ তাওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থের ভবিষ্যৎবাণী থেকে অবগত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) যে পৃথিবীতে শুভাগমন করবেন এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন এবং অতি আগ্রহের সঙ্গে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আহলে কিতাবধারী ব্যতীত মক্কা ও মদিনাবাসি সত্যান্বেষী লোকেরাও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিলেন (সায়িদ সোলায়মান নদভী-সীরাতুন্নবী পৃষ্ঠাঃ ৬০৭-৬০৮)। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলি থেকেও এর সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো:

১) বার বছর দুই মাস বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা) চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করেন। সিরিয়ার বুসরা নগরীতে নেষ্টরীয় খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ) প্রচারিত পবিত্র একত্ববাদ ও ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলছিল। যে পাহাড়ের উপর নেষ্টরীয় গির্জাটি অবস্থিত ছিল, সেটির পাদদেশে আবু তালিব তাঁবু খাটালেন। কাফেলার উপর ছায়া দান করে আসছিল যে মেঘমালাটি তা থেমে গেল। গির্জার প্রধান পাদ্রীর (যাজকের) নাম ছিল বহীরা (বুহায়র)। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে গির্জার পাদ্রী বুহায়রা অনুমান করলেন হেজাজ থেকে আগত কাফেলার মধ্যে রয়েছেন সেই মানুষটি, যার জন্য তিনি এতকাল অপেক্ষা করে আসছেন। সেই নবী (সা) যার আগমনবার্তা পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে আগেই ঘোষিত হয়েছে এবং বহীরা (বুহায়রা) সর্বদায় তাঁরই আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন। কাফেলার বালক, বৃদ্ধ, অভিজাত, দাস সবাইকে দাওয়াত দিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে আসার জন্য একজন দূত পাঠিয়ে মক্কার অতিথিদের আগমনের জন্য পাদ্রী বুহায়রা গির্জার প্রবেশপথে অপেক্ষা করছিলেন। মক্কাবাসী অতিথিদের মধ্য হতে একজন অবাক হয়ে বলে উঠলেন, "হে বুহায়রা! আমি লাত ও উজ্জার কসম খেয়ে বলছি, আপনার আচরণ আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এর আগে বহুবার আপনার গির্জার পাশ দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু কখনো আপনি আমাদের প্রতি কোন মনোযোগ এবং আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র লক্ষণও দেখাননি। আজ আপনার কি হয়েছে?" বুহায়রা জবাবে বললেন, "আপনি ভুল বলেননি। আজ আমার এরকম করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু এখন আপনারা আমার অতিথি। তাই আমি আশা করি, আমি আপনাদের সবার জন্য যে খাবারের আয়োজন করেছি, তাতে শরীক হয়ে আমাকে ধন্য করবেন।"

যখন নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ নিদারুণ ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার গ্রহণ করেছেন, তখন বুহায়রা প্রত্যেককেই ভালোভাবে পরখ করতে লাগলেন এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করতে চাইলেন। ধর্মগ্রন্থে যে ব্যক্তির কথা বর্ণিত ছিল সেই বর্ণনার সঙ্গে তিনি কোন ব্যক্তির মিল খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি (বুহায়রা) তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কোরাইশ বন্ধুগণ! আপনারা কি তাঁবুতে কাউকে রেখে এসেছেন?" প্রতি উত্তরে তাঁরা জানালেন, "হ্যাঁ! একজন খুব অল্প বয়সী বালককে আমরা মালামাল দেখার জন্য তাঁবুতে রেখে এসেছি।" কিন্তু বুহায়রা আগ্রহ ভরে আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কেন তাঁকে এখানে নিয়ে এলেন না? যান এখনই গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসুন যাতে সেও আপনাদের সবার সাথে একসঙ্গে খেতে পারে।" যখন তাঁকে (বালক মুহাম্মদ (সা)-কে) আনা হলো দেখা গেল যে, এক খণ্ড মেঘ তাঁর মাথার উপর ছায়া দান করে আসছে।

বালক মুহাম্মদ (সা)-কে মেহমানদের মাঝে হাজির করলেন। বুহায়রা বালক মুহাম্মদ (সা)-কে গভীরভাবে দেখলেন এবং অতিথিদের খাদ্য গ্রহণ ও পানাহারের পর তিনি (বুহায়রা) মুহাম্মদ (সা)-কে এক কোনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বৎস! আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।" বালক মুহাম্মদ (সা) বললেন, "ঠিক আছে, প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দেব।"

এরপর বুহায়রা তাঁকে, তাঁর পরিবার, তাঁর সামাজিক অবস্থান, যেসব স্বপ্ন তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে এবং আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা) ঐ জ্ঞানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর জামার কলার একটু ফাঁক হতেই ঐ ফাঁক দিয়ে বুহায়রা তাঁর পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে অঙ্কিত 'নবুয়তের মোহর' দেখতে পেলেন। এর ফলে বুহায়রার শেষ সন্দেহের অবসান হলো। বুহায়রা অনুভব করলেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বালকই সেই নবী (সা); যার আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে পবিত্র কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে। এরপর বুহায়রা উঠে গিয়ে আবু তালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বালক আপনার কি হয়?" আবু তালিব বলিলেন, "আমার ছেলে।" বুহায়রা বললেন, "না, সে তো আপনার ছেলে নয়।" আবু তালিব বললেন, "সে আসলেই আমার ছেলে নয়, তবে সে আমার ভাইয়ের ছেলে।" বুহায়রা বললেন, "আপনার ভাইয়ের কি হয়েছে?" আবু তালেব বললেন, "এই ছেলে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় আমার ভাই ইন্তেকাল করেছেন।" বুহায়রা বললেন, "এবার আপনি ঠিক বলেছেন। তাহলে আমার কথা শুনুন। এই ত বিশ্ব জগতের সরদার, এই ত যীশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা বিশ্বনবী, ইনিই জগতের কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত হইবেন।" এই কথা শুনে কাফেলার লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। বুহাইরা বললেন, "আপনার ভাতিজাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি

ফিরে যান। সব সময় তাঁর উপর নজর রাখবেন। বিশেষ করে ইহুদীদের কাছ থেকে সাবধান থাকবেন। যদি তারা এই বালককে দেখে চিনতে পারে, যেমন আমি তাঁর পিঠের নিদর্শন দেখে চিনতে পেরেছি, আল্লাহর কসম, তারা ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহান ভূমিকা পালন করার জন্য আপনার ভাতিজাকে আল্লাহ নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।" তাওরাত ও বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণ গঠন প্রকৃতি ও আগমণবার্তা স্পষ্ট করে বর্ণিত ছিল বলেই বুহায়রা চিনতে পেরেছেন। (সুনানে তিরমিযী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৩)।

২) রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি প্রকম্পিত হৃদয়ে হযরত খাদিজা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত খাদিজা (রা) আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফেলের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত ঘটনা ওয়ারাকা বিন নাওফেলের নিকট বর্ণনা করেন। তাওরাতের এই বৃদ্ধ জ্ঞান তাপস সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই নামুসে আকবর হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে পাঠিয়েছিল, তিনি সেই নামুসে আকবর। আপনি যখন কুরাইশদেরকে সত্যধর্মের দিকে ডাকবেন, তখন আপনার গোত্রের লোকেরা আপনাকে দেশান্তর করবে। ততদিন পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকতাম, তাহলে প্রাণ দিয়ে হলেও আপনাকে সাহায্য করতাম।" ওয়ারাকার কথায় রাসূল (সা) অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমার বংশধরের লোকেরা কি আমাকে দেশ হতে তাড়িয়ে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন, "নিশ্চয়ই! আপনি যখন সত্য ধর্ম প্রাপ্ত হবেন, আপনার স্বগোত্রীয়গণ আপনার সাথে শত্রুতা শুরু করবে।" এরপর ওয়ারাকা বিন নাওফেল বেশি দিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন না।

৩) রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করার পর, আনসারদের নানা গোত্র ও দল সকলেই আল্লাহর নবী (সা)-কে নিজ গৃহে নিয়ে যেতে লালায়িত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আমার উট আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশ হয়েছে। যার গৃহদ্বারে সে বসবে, আমাকে তারই মেহমান হতে হবে।" উট স্বাধীনভাবে চলতে চলতে অবশেষে নাজ্জাস গোত্রের মহল্লায় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর বাড়ির সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সম্মানিত অতিথিদেরকে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাড়িতে মেহমান হলেন। এই আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর পূর্বপুরুষ ছিলেন বাদশাহ তোব্বা। এককালে ইয়ামেনের পরাক্রান্ত সম্রাটের উপাধি ছিল তোব্বা। আল্লাহর হাবিব আখেরি নবীর (সা)

পৃথিবীতে আবির্ভাব এর সাতশত বছর আগে আস'আদ ইবনে কারব তোব্বা ইয়েমেনের পরাক্রান্তশালী সম্রাট ছিলেন। সম্রাট তোব্বা প্রাচ্যদেশ সমূহ পদানত করার উদ্দেশ্যে ইয়ামেন হতে দ্বিগবিজয়ে বের হন। মদিনা শরীফ দখল করে তার পুত্রকে এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নিজে সিরিয়া ও ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন। মদিনাবাসীরা তাঁর পুত্রকে হত্যা করে। সম্রাট তোব্বা পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মদিনায় ফিরে এসে হত্যাকাণ্ড শুরু করেন। নগরবাসীদের এই ঘোর দুর্দিনে আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক ইহুদী আলেম-পণ্ডিত সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে বললো, "এই শহর আল্লাহর হেফাজতে সুরক্ষিত। একে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। কেউ তা করতে চাইলে সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কারণ আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে এর (মদিনার) বৈশিষ্ট্য পাঠ করেছি। তাওরাতে একে 'তাইয়্যেবা' অর্থাৎ পবিত্র ধাম উল্লেখ করা আছে। আরও উল্লেখ আছে, এটা সর্বশেষ পয়গম্বর এর দারুল হিজরত তথা হিজরত ভূমি, প্রধান কর্মস্থল ও কিয়ামত পর্যন্ত তার শেষ বিশ্রামের স্থান। তিনি হবেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। আপনি এই শহরকে নিশ্চিহ্ন করার ধারণা ত্যাগ করুন।" তারপর এসব সাধকগণ সম্রাটের সামনে আখেরী নবীর (সা)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দ্বীনের প্রাধান্য কায়েম থাকা সম্পর্কিত বিভিন্ন সুসংবাদ সম্মলিত তথ্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সচ্চরিত্র মহৎ প্রাণ সম্রাট তোব্বা এসকল বক্তব্য শ্রবণ করে এবং তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আখেরি নবীর (সা) গুণ গরিমার কথা অবগত হয়ে আপন সংকল্প ত্যাগ করলেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, সম্রাট তোব্বা শেষ যমানার পয়গম্বরের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তার সঙ্গে চারশত ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। তারা সম্রাটের সঙ্গ ত্যাগ করে আখেরি নবীর (সা) সংসর্গ লাভের আশায় মদিনায় অবস্থান করতে থাকেন। সম্রাট তোব্বা চামড়ার লিখিত একটি পত্রে নিজের ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন। এই পত্রের কিয়দংশ এইরূপ: "আমি আহমদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেই যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। যদি আমি তাঁর সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই আমি তাঁর একজন সেবক ও সহায়তাকারী হব।" সম্রাট তোব্বা এই পত্রটি মোহর করে দলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করেন এবং ওসিয়ত করেন যে, যদি তিনি পয়গম্বরের (হযরত মুহাম্মদ (সা))-এর সময়কাল পান তবে পত্রটি যেন তাঁর (হযরত মুহাম্মদ (সা))-এর কাছে পৌঁছে দেন। নতুবা নিজের সন্তানদেরকে এবং তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে এই নির্দেশ সহকারে হস্তান্তর করতে থাকেন। আখেরি নবীর (সা) বসবাসের জন্য নির্মিত প্রাসাদের জন্য একজন ইহুদী পণ্ডিতকে মোতোয়ালি নিযুক্ত করেন এবং

এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, "আমার এই প্রাসাদ তাঁর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি যেন অনুগ্রহ করে এখানে অবস্থান করেন।" সম্রাটের আন্তরিকতাপূর্ণ দান আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উট আল্লাহর আদেশে সে গৃহের আঙিনায় এসে বসে পড়ল। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সেই ইহুদী পণ্ডিতেরই বংশধর ছিলেন এবং সম্রাট তোব্বার পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদিনায় আগমনের সময় পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) কাছে রক্ষিত ছিল। নবী করিম (সা) মদিনায় এসে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) গৃহে অবস্থান করলে, সেই চামড়ায় লেখা পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে পেশ করলেন। (হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (র)-এর কিতাব-জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান' হৃদয়তীর্থ মদীনার পথে, পৃষ্ঠা-২৮-২৯, ৪৪ এবং রওজা শরীফের ইতিকথা, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা-১৯-২০)।

৪) মদিনার ইহুদীদের প্রধানতম সভাপতি ও তাওরাতের বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ধর্মযাজক পণ্ডিত ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। মদিনাবাসী মুসলমানগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন তখন এই ইহুদী পণ্ডিত তাঁর দর্শন লাভে ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) বাড়িতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাওরাতে প্রতিশ্রুত নবী কিনা, ইহুদী ধর্মযাজক আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের তা পরীক্ষা করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখা মাত্রই তাঁর অন্তরে সাক্ষ্য দিতে থাকে, 'এই পবিত্র মুখমণ্ডল মিথ্যা নবী বা ভন্ড লোকের মুখমণ্ডল নহে।' তবুও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) নবীজিকে ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি জটিল প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অতি সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর এমন সন্তোষজনক উত্তর দিলেন যে, ইহাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর কোন সন্দেহ রইল না। তাওরাত গ্রন্থে শেষ নবীর যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে তা অবিকল বিদ্যমান আছে দেখতে পেয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "তাওরাতে একথাও লিখিত আছে, হযরত ঈসা (আ)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরের পার্শে দাফন করা হবে।

৫) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইসলামের দাওয়াতনামা নিয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছিদ (দূত) পৌঁছলেন, তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য বুখারী শরীফের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখা যেতে

পারে)। আবু সুফিয়ানের উত্তর শুনে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস বিনা দ্বিধায় প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করলেন, "তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে যে সকল অবস্থা বর্ণনা করলে, যদি তা সত্য হয় তবে একদিন আমার পদতলস্থ ভূমি (সাম্রাজ্য) তাঁর অধিকারে আসবে। যদি সম্ভবপর হতো তবে আমি স্বয়ং তাঁর খেদমতে হাজির হইয়া সাক্ষাৎ করতাম এবং আমি নিজ হাতে তাঁর পদযুগল ধৌত করতাম।"

৬) হাবশার রাজা নাজ্জাশীর হযরত জাফর (রা)-এর মুখ হতে পবিত্র কোরআন শরীফের (সূরা মরয়ম) তিলাওয়াত শুনে নয়নযুগল হতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং বললেন, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পয়গম্বরের প্রতি সহস্র সহস্র ধন্যবাদ। হযরত মুহাম্মদ (সা) সেই নবী যাঁর কথা আমি ইঞ্জিলে পাঠ করেছি। পবিত্র কোরআনের বাণী আর ইঞ্জিল একই প্রদীপের আলো। আল্লাহর কসম, যদি আমার উপর রাজ্যশাসন ভার অর্পিত না থাকতো তবে আমি তোমাদের সঙ্গে আখেরি যামানার পয়গাম্বরের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর পাদুকা মোবারক মাথায় রেখে আমার জীবনকে ধন্য করতাম। আমি নিজ হাতে তাঁকে ওযু করাতাম। তাঁর পদ সেবাই একমাত্র মুক্তির পথ (মাওলানা আশিক এলাহী মারাঠী– ইসলাম, পৃষ্ঠা- ৬১)।" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নাজ্জশী যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিয়ে গায়েবানা জানাযার নামাজ পড়েন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। (সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা– ৯৯)।

ইহুদী ও আরবদের মাঝে যুদ্ধ বাধলে ইহুদীগণ এই বলে শাসাত, 'শীঘ্রই একজন পয়গম্বরের আগমণ ঘটবে। তাঁর আমলে আমরা তোমাদেরকে পরাভূত করে পূর্ণ জয়লাভ করব।' তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমণ বার্তা স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও উক্ত দুই ধর্মালম্বীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনিত ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করে চলছে।

এই ব্যাপারে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ (রা)। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইহুদী আলেমের মেয়ে এবং আরেকজন বড় ইহুদী আলেমের ভাইঝি। তিনি (হযরত সাফিয়্যাহ (রা)) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সা) মদিনা আগমনের পর আমার পিতা ও চাচা দুইজনেই নবীজি (সা)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা (আমার পিতা ও চাচা) ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদের এভাবে আলাপ করতে শুনি; চাচা বললেন, 'আমাদের কিতাবে (তাওরাতে) যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে, ইনি কি সত্যিই সেই নবী?' পিতা

বললেন, 'আল্লাহর কসম ইনিই সেই নবী।' চাচা বললেন, 'এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?' পিতা বললেন, 'হ্যাঁ।' চাচা বললেন, 'তাহলে এখন কি করতে চাও?' পিতা বললেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাব (দালায়েলুন নবুওয়াহ লিল বাইহাকী-সীরাতে ইবনে হিশাম)।'

তাওরাত ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যৎবাণী হতে ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ নিঃসন্দেহভাবে শেষ নবীর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই জন্যই তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে নানাপ্রকার প্রশ্ন করত এবং তিনি (রসূলুল্লাহ (সা)) তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রসূল কিনা নানা উপায়ে পরীক্ষা করতে অতঃপর অনেকেই বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন,

হযরত মুহাম্মদ (সা) একা পবিত্র কা'বা গৃহে ইবাদতে মশগুল ছিলেন, এমন সময় হাবশার বিশ জনের একদল খ্রিস্টান এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে ইসলাম ধর্মের সমস্ত তথ্য অবগত হয়ে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন। নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে যে-সব বিষয়ে তারা অবগত ছিলেন সে সমস্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনেক প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সব বিষয়ের উত্তর দিলেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থে যে শেষ নবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইনি সেই মহানবী, তখন সকলে সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলেন। (আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবন হিশাম আল হুমায়রী-আস সীরাতুন নববিয়্যা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা– ৩৯১-৩৯২)

মদিনার ইহুদীদের নেতা ও আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় নরাধম ও পাপিষ্ঠ। আপনি তাদের পাপিষ্ঠতা পরীক্ষা করুন। আপনি তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন– আমি কে এবং আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?"

রাসূলুল্লাহ (সা) একদল ইহুদীকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? সে তোমাদের মধ্যে কোন স্তরের লোক?" সমবেত ইহুদীরা একবাক্যে উত্তর দিল, "তিনি আমাদের নেতা ও নেতার পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্বান ও বিদ্বানের পুত্র।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, "যদি সে আমার প্রতি ঈমান আনে এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা কি তা স্বীকার করে নিবে?" সকলেই বলল, 'যদি তিনি ঈমান আনেন এবং আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেন তবে আমরাও তাই করব।' রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় বাক্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং ইহুদীরাও তেমনিভাবে তিনবার জবাব দিল। অতঃপর রাসূল (সা)

সাহাবাদের বললেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে সালামকে বের হয়ে আসতে বল।" আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বের হয়ে আপন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, তিনি রাসূল ও আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পুরুষ। এরপর কেন তাঁকে অনর্থক অস্বীকার করে নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছো?' ইহুদীরা জবাব দিলো, 'তুমি মিথ্যা বলছো। সে আল্লাহর রাসূল সে কথা আমরা জানি না।' অতঃপর তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সম্পর্কে বলতে লাগল, 'আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম দুষ্ট এবং দুষ্টের পুত্র। সে সর্বাধিক মূর্খ এবং মূর্খের পুত্র।' এ হল ইহুদীদের ধূর্ততা দুশ্চরিত্রের নমুনা। অথচ আল্লাহপাক কোরআন শরীফে বলেন, "যাহাদিগকে আমি কিতাব (তাওরাত-ইঞ্জিল) দান করিয়াছি, তাহারা নিজ নিজ পুত্রদিগকে যেমনভাবে চিনে তাঁহাকে (রাসূল (সাঃ)-কে)-ও এইভাবেই (নিঃসন্দেহে) চিনে।" (সূরা আন-আম, আয়াত- ২০)।

পিতার কাছে সন্তানের পরিচয় সুনিশ্চিত। ইহুদী-খ্রিস্টানদের নিকট রাসূলে করীম (সা)-এর পরিচয়ও তেমনি ছিল। সাম্প্রদায়িকতার আবিলতায় যাদের অন্তঃকরণ অন্ধকার হয়ে পড়েছিল, তারা আবে-হায়াত লাভে সমর্থ হয় নাই। তাদের এই জ্ঞান, জ্ঞান-পাপীদের কোন উপকারে এলোনা। বিশ্বের সকল জ্ঞান-পাপীদের পরিণতি বুঝি তাই হয়ে থাকে (হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (র)-এর কিতাব-জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান' হৃদয়তীর্থ মদীনার পথে, পৃষ্ঠা– ৪৮-৪৯)।

"ইহুদীরা যে নবীর আগমণ প্রতিক্ষায় দিন গুনছিলো সেই নবীর আগমনের পর তারাই নবীর সবচেয়ে বিরোধীপক্ষে পরিণত হলো।" (মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৬৭, তাফসীর ইবনে কাসীর)। আল্লাহপাক কোরআন শরীফে এই সম্পর্কে বলেনঃ "আর যখন আল্লাহর তরফ হতে তাদের সামনে সেই কিতাব (কুরআন শরীফ) এলো, যা তাদের কিতাবেরও (তাওরাত ও ইঞ্জিল)-এর সত্যতা প্রণয়নকারী বা সমর্থনকারী, অথচ পূর্বে সেই কিতাবের দ্বারা কাফেরদের উপর জয়ী হওয়ার প্রার্থনা করত, যখন তা এসে গেলো (অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন শরীফ ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের নিকট পৌঁছলো) যা তাদের পরিচিত (তাদের জানা-চেনা বস্তু) তখন তাহারা (ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা) উহা অমান্য করে কুফুরি করলো। আল্লাহ পাকের অভিশাপ তাদের উপর (সূরা বাকারা আয়াত নং– ৮৯)। ♦

প্রফেসর ড. মাহমুদ এম. আইয়ুব

মুসলমানদের জীবনে ও চর্চায় আল-কুরআন

মূলঃ ড. মাহমুদ এম. আইয়ুব

অনুবাদঃ মুস্তাফা মাসুদ

এই কোর-প্রবন্ধটির লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গ্রন্থকার, সম্পাদক এবং বহু পুরস্কার/সম্মাননায় ভূষিত ইসলামি পণ্ডিত প্রফেসর ড. মাহমুদ এম. আইয়ুব (মাহমুদ মুস্তাফা আইয়ুব); যিনি 'স্কলার অব লেবানন' হিসেবে সমধিক পরিচিত। এটি তাঁর 'The Quran in Muslim Life and Practice' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ; ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জনাব আইয়ুবের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, দক্ষিণ লেবাননের ছোট্ট শহর আইন কানা'র এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে। তিনি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত, লেবানন থেকে ১৯৬৪ সালে দর্শনশাস্ত্রে বি.এ., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে ১৯৬৬ সালে 'রিলিজিয়াস থট' বিষয়ে এম.এ. এবং ১৯৭৫ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে 'হিস্টরি অব রিলিজিয়ন' বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে দীর্ঘকাল প্রফেসর ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশকিছু বইয়ের

লেখক; এর মধ্যে The Qur'an and Its Interpreters - Volume I (1984), The Qur'an and Its Interpreters - Volume II (1992) , Islam: Faith and History (2005), The Crisis Of Muslim History: Religion And Politics In Early Islam (2014) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাহমুদ এম. আইয়ুবের জীবন নাটকীয়তায় ভরা। প্রথম জীবনে তিনি এক ব্রিটিশ মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ লেখাপড়া শেখানো ছিল না; কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে খ্রিষ্টান বানানোই ছিল তাদের আসল কাজ। এই পরিবেশের প্রভাবে পড়ে আইয়ুব এক পর্যায়ে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরিশেষে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। বিষয়টি তাঁর এবং তাঁর ইসলাম-অন্তপ্রাণ বাবা-মায়ের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ ও টানাপড়েন সৃষ্টি করে। অবশেষে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মোহভঙ্গ হয় এবং আবার তিনি ফিরে আসেন ইসলামের চিরন্তন কল্যাণী ছায়াতলে।

'তথ্যসূত্র' অংশটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো না একারণে যে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক/গবেষকগণ রেফারেন্স যাচাই করতে চাইলে বা সংশ্লিষ্ট মূল গ্রন্থটি পড়তে/দেখতে চাইলে মূল ইংরেজিটাই এক্ষেত্রে তাঁদের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হবে।–অনুবাদক

ওহী হিসাবে আল-কুরআন

পবিত্র কুরআনের মাঝে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান আল্লাহর কুদরতি কণ্ঠস্বর শুনতে পান, যে-কণ্ঠস্বর পথনির্দেশনা (হিদায়েত) ও উৎসাহ প্রদানকারী, সান্ত্বনা ও তিরস্কার প্রদানকারী, সৎপথগামীদেরকে করুণা ও চির-সুখের (জান্নাত) প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী; পাশাপাশি দুষ্টকে স্থায়ী আজাবের ভয় প্রদানকারী। পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহ্‌র বাণী, যা মানুষের সময়ে প্রবেশ করেছে ইতিহাসকে রূপ দেওয়ার জন্য। মুসলমানদের বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, ফেরেশতা হজরত জিবরাঈল (আ) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার অদূরে হিরা পর্বতের একটি গুহায় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। জানা যায়, এই প্রাথমিক সাক্ষাতে জিবরাঈল (আ) মুহাম্মদ (সা)-কে এত জোরালোভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন যে, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তখন জিবরাঈল বলেন, ''পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পাঠ করো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'' (সূরা 'আলাক, আয়াত: ১–৫]

পবিত্র কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে। কুরআনের ছোটো ছোটো অংশ– কখনো একক আয়াত, আয়াতগুচ্ছ, আবার কখনো সম্পূর্ণ সূরা দীর্ঘ বাইশ বছরেরও বেশি সময়

ধরে অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন মুসলমানদের নিকট নিছক এমন কোনো শব্দাবলি নয়, যা কেবল উচ্চারণ করা যাবে, শোনা যাবে এবং বাণীবদ্ধ বা রেকর্ড করা যাবে; বরং এটি পঠিত ও লিখিত একমাত্র পার্থিব কুরআনের জান্নাতি প্রতিরূপও। পবিত্র কুরআনের জান্নাতি প্রতিরূপের আদল সমগ্র মানবেতিহাসজুড়ে মুসলমানদের জন্য ওহীর উৎস, এবং তা মহান আল্লাহ কর্তৃক চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত। এটি মানব জাতির সাথে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার চুক্তি যা তিনি আদম-সন্তানদের সাথে এমন সময় সম্পাদন করেছিলেন, যখন পারলৌকিক জগতের কোনো জ্ঞান বা ধারণা তাদের ছিল না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ওহীর প্রাপক হওয়ার সাথে সাথে এই পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের বিষয়েও ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন; সে-ভবিষ্যৎবাণী হলো: তিনি এক গভীর আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুভব করবেন, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে থরথরে শীতের কাঁপুনি কিংবা ঠাণ্ডা শীতে ঘামঝরানো গরম অনুভব করবেন, ঘণ্টা বাজানোর মতো শব্দ শুনবেন। এসব শব্দ তাঁর চেতন-অবস্থায় মানবীয় শব্দাবলিতে রূপান্তরিত হয়েছিল যা তিনি মুখস্থ করেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট 'মহিমান্বিত ও বররকতময় রাতে'ও নাজিল করা হয়েছিল [সূরা: ৪৪, আয়াত: ৩ এবং সূরা: ৯৭, আয়াত: ১], যে রাত সব মুসলমানের নিকট 'মহিমান্বিত রজনী' হিসেবে সম্মানিত। এই ঘটনাটি মহানবী (সা)-এর জীবনকে শুদ্ধতার এক অনন্য স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল এবং তাঁকে অনুসরণের জন্য মুসলমানদের নিকট তা এক উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: ''আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?'' [৭:১৭২] অতঃপর যারা উপাস্য হিসেবে আল্লাহকে বেছে নিয়েছিল তারা তাঁকে নিশ্চিত করেছিল একথা বলে: ''হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম।...'' [ঐ] পবিত্র কুরআন হলো এই অঙ্গীকারের সিলমোহর ও সাক্ষ্য। এর বার্তা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও মুসলমানদের অঙ্গীকারের এক শক্তিশালী সত্যায়ন।

পার্থিব পাঠ্য হিসেবে আল-কুরআন মুসলমানদের ইতিহাসের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ হয়ে আছে। মহানবী (সা)-এর সময়ে এটি আরব সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানসূচক জবাব হিসেবে কাজ করেছিল। কুরআন মানব জীবনের অর্থ ও সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে মহানবী (সা)-এর নানান প্রশ্নের জবাবও ছিল, এবং মক্কার, পরবর্তীতে মদিনার নবসৃষ্ট মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সাথে তা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। কুরআনের বহু আয়াত নাজিল হয়েছিল নির্দিষ্ট প্রশ্ন কিংবা জীবনে উদ্ভূত সমস্যবলির জবাবে। এসব জবাব মুসলমানদের নিকট সব

সময় এবং সর্বস্থানে সাধারণ নীতি, নৈতিক অপরিহার্যতা বা অবশ্যকরণীয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সরাসরি সম্বোধিত [দেখুন: সূরা নং-৩৩, আয়াত: ৩২] নবী-পরিবারকে মুসলমানেরা পৃথিবীর সকল পরিবার ও সমাজের আদর্শ হিসেবে দেখে।

কুরআন সংকলন

পবিত্র কুরআন নাজিলোত্তরকালে আয়াতগুলো দক্ষ মুসলিম নারী ও পুরুষদের দ্বারা লিখিত ও মুখস্থ করিয়ে রাখা হয়েছিল। তবুও, মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের দশ বছর পর ৬৩২ খিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাৎকালে, এখন কুরআন বলতে আমরা যেমনটা বুঝি, তেমন ছিল না। সেসময় আয়াত ও সূরাগুলো টুকরো টুকরো আকারে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুলিপিকারদের দ্বারা লিখিত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত চামড়ার খণ্ড, পাথর, তালপাতা ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল; এর পাশাপাশি মানুষের স্মৃতিতেও তা সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বা আদর্শ রূপ দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। সূরাগুলো সাধারণত এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যেন বড়ো সূরা থেকে ছোটো সূরা– এভাবে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যায়। এটি সেই সুবিন্যস্ত সংকলন, যেটি পবিত্র কুরআনের প্রামাণ্য ভাষ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য পবিত্র কুরআনের যতটা সম্ভব মুখস্থ করা জরুরি। কোনো নির্জন কক্ষে বা কোনো জামাতে নামাজ শুরু করা হয় পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত দিয়ে। মুসলমানদের জন্য নামাজকে বিবেচনা করা হয় আল্লাহর বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করার এক পন্থা হিসেবে। এই ঐশ্বরিক-মানবিক আন্তঃবিনিময়ের বিষয়টি এক হাদিসে কুদসিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে: ''আমি উপাসনাকে (সালাত) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করেছি, এবং আমার বান্দা যে-কোনোকিছুর জন্যই প্রার্থনা করবে; কারণ, বান্দা যখন বলে: 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'অলামীন' অর্থাৎ সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি, তখন আল্লাহ বলেন: 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' বান্দা যখন বলে: 'পরম ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়', তখন আল্লাহ বলেন: 'আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে...এটুকুই আমার অংশ এবং যা অবশিষ্ট রইল, সবটুকুই তার'।'' [এম. আইয়ুব: দ্য কুরআন অ্যান্ড ইট্স ইন্টারপ্রেটার্স]

কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা ফাতিহাকে নিখুঁত প্রার্থনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাত আয়াতবিশিষ্ট এই সূরার প্রথম সাড়ে তিন আয়াত আল্লাহর

প্রশংসাসূচক প্রার্থনা; সূরার অবশিষ্ট অংশ হলো হিদায়েত ও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা। শুধু সূরা ফাতিহা নয়, মুসলমানদের কাছে পুরো কুরআনই প্রার্থনা। এভাবেই প্রতি ওয়াক্ত নামাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে উপস্থিত হন এবং বান্দা আল্লাহর কুদরতি কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। নামাজ হলো কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগসেতু।

কুরআন তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআন আল্লাহর অনুগ্রহ ও গুণ, প্রশান্তি ও হিদায়েতের উৎস। এর দ্বারা জন্মকালে শিশুকে স্বাগত জানানো হয়, এর দ্বারাই সে সারাজীবন হিদায়েত লাভ করে, এবং অন্তিমকালে এই কুরআনের দ্বারাই তাকে শেষবিদায় জানানো হয়। কুরআনের সাথে জীবনব্যাপী এই দীর্ঘ সফরের সময় পুরো কুরআনের তিলাওয়াত অন্তর্ভুক্ত থাকে– কখনো একটি নির্দিষ্ট সময় বা এক সপ্তাহ, এক মাস বা তার বেশি দৈনিক তিলাওয়াতের জন্য পবিত্র গ্রন্থের সূরা অনুসারে পুরো কুরআনের তিলাওয়াত অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই প্রক্রিয়াটি খতমে কুরআন বা কুরআন তিলাওয়াতের সমাপ্তি হিসেবে পরিচিত। পবিত্র রমজান মাসের মতো বিশেষ উপলক্ষ্যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা তারাবি নামাজে পুরো কুরআন খতমের ব্যবস্থা করেন।

মুসলমানেরা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, মুখস্থ, অনুলিপি করা কিংবা এক কপি কুরআন তাদের ঘরে থাকাকে পরম সৌভাগ্যের উৎস হিসেবে মনে করে। বস্তুত, কিয়ামতের দিনে বেহেশতে মুসলিম নর/নারীর অবস্থান নির্ধারিত হবে কুরআন তিলাওয়াতের সংখ্যার ওপর– পার্থিব জীবনে সে কুরআনের কত বেশিসংখ্যক আয়াত তিলাওয়াত করেছে তার ওপর। মুসলমানদের গুণ ও সৌভাগ্যের আরও বৃহত্তর উৎস পবিত্র কুরআনের নীতি ও বিধানগুলি অধ্যয়ন ও অনুধাবনের মধ্যে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ইরশাদ হচ্ছে: যে কোনো মসজিদে সমবেতভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও অনুধাবনের জন্য একত্রিত লোকেদের সবার ওপরই 'সাকিনাহ'– আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। কুরআন তিলাওয়াতকারীগণের মধ্যে যারা যথানিয়মে কুরআন মুখস্থ (হিফজ) করেন ও তা চালু রাখেন (হাফিজ), তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন মুসলমান নর-নারীর অন্তর ও ঘরকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আসমানি প্রত্যাদেশের (ওহীর) অংশী করে তোলে। পবিত্র কুরআনের শব্দ অট্টালিকা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা যানবাহনে মুদ্রিত থাকলে আল্লাহর রহমত বা সুরক্ষা পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

সর্বোপরি, কুরআন হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক বা হিদায়েতের গ্রন্থ (সূরা বাকারা, আযাত: ১–৫)। ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, আয়াতসমূহের অর্থ ও তার প্রয়োগসহ নিবিড়ভাবে অধ্যয়নের এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণে সেসবের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মুসলিম সমাজের ভিত্তি। কুরআন মাতাপিতার সাথে একটি শিশুর সন্তানোচিত সম্পর্ক এবং সন্তানের প্রতি মাতাপিতার দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সহ-মুসলিম ও অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও তার শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রজাসাধারণে সম্পর্ক, এবং আল্লাহর সাথে একজন বান্দার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এটি যুদ্ধ ও শান্তির সময় সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি যুদ্ধ পরিচালনার কারণ এবং বিধিবিধানও নির্ধারণ করে। সংক্ষেপে বলা যায়– কুরআন মুসলমানদের জন্য একটি স্কুল; এটি তাদেরকে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে নিয়মানুবর্তী করে।

অনুপ্রেরণা হিসাবে আল-কুরআন

অনিবার্যভাবে পবিত্র কুরআন ঘটনা, নীতিকথা, কাহিনি, আদেশ ও নিষেধগুচ্ছের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম্পরা। সুতরাং মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রেণিকরণ হচ্ছে উদ্দেশ্য, বাণী, বিশেষ অর্থবোধক শব্দগুচ্ছ বা প্রবচন এবং শৈলীর মেলবন্ধন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই আরবি ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনকে শব্দগুচ্ছের শৈলীসমৃদ্ধ ঐক্যতান হিসাবে যথার্থই বর্ণনা করেছেন। কুলআনের শিক্ষা ও চিন্তাভাবনাগুলিই শুধু নয়, এর শব্দ এবং বাক্যাবলি ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির ভিন্নতানির্বিশেষে মুসলমানদের জীবন ও কথাবার্তার সাথেও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। কুরআনের শব্দের সাহায্যে একজন মুসলমান তার সফলতার জন্য এভাবে আল্লাহর দরবারে সন্তুষ্টি ও শুকরিয়া প্রকাশ করে: তাবারক আল্লাহ (সবই আল্লাহর রহমত) অথবা আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর)। কুরআনের বাণীর সাহায্যে একজন মুসলমান কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু অথবা মৃত্যুমুখে পতিত কারো জন্য শোক ও আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশ করে এই বলে: 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন'– আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। [সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৬] কুরআনের বাণীর সাহায্যে, বিশেষত এর প্রারম্ভিক সূরা উচ্চারণের সাহায্যে বিবাহের নবদম্পতিদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা হয়, চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং ভয় ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

মুসলমানেরা পবিত্র কুরআনকে অলৌকিক বাণী হিসেবে সম্মান করে। এর অনুকরণীয় ভঙ্গি বা রীতি, বিশিষ্টার্থক শব্দাবলি এবং অনুভূত ঐক্যকে মুসলমানদের জন্য এর অপার্থিব উৎসের প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়। এর ব্যাখ্যা (তাফসীর) মুসলিম সমাজের সেরা কিছু মন-মানসকে দখল করে নিয়েছে। এর ব্যাকরণ ও ভাষা, বাচনভঙ্গি, উপমা ও রূপক, নীতিকথা, কাহিনি ও ঘটনাবলির অধ্যয়ন-গবেষণা এক পরমপবিত্র বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে। তেমনিভাবে এর তিলাওয়াত– হোক তা সাদামাটা তারতিলসহ কিংবা উন্নততর শৈল্পিক সুরময় তাজবিদসহ, মুসলমানদের ইতিহাসজুড়ে সর্বত্র মুসলিম সমাজের সেরাকণ্ঠ এবং মেধাবীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেই এর শক্তি ও সৌন্দর্য অনুভব করেন। সুতরাং, কুরআন তিলাওয়াতকারীরা মুসলমান সমাজে এক বিশেষ সম্মানের স্থান দখল করে আছেন। কুরআন আরবি সাহিত্যের উৎকর্ষের মান নির্ধারণ করেছে। তদুপরি এটি অন্যান্য সব মুসলিম দেশের ভাষাসমূহের সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুসলমানেরা একে অপরকে অভিবাদন জানায় কুরআনের শব্দাবলির সাহায্যে, এবং এর শব্দাবলি ও চিন্তাভাবনার সাহায্যে তারা তাদের নিজস্ব অনুভূতি ও ভাবনারাজির প্রকাশ ঘটায়। পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ''স্পষ্ট আরবি ভাষায়'' [সূরা নাহল, আয়াতাংশ ১০৩]। নাজিল হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। কুরআন যদিও বিশ্বের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তবুও তিলাওয়াত করা হয় এর মূল (আরবি) ভাষায়। অন্যান্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও এর অর্থের তাফসীর হয়েছে কেবল এর শিক্ষাসমূহ অধ্যয়ন ও অনুধাবনের উদ্দেশ্যে। কুরআনকে এর সামগ্রিক মাত্রায় জানতে হলে অবশ্যই এর মূল ভাষায় তা অধ্যয়ন করতে হবে। এই লক্ষ্যটি অনারবভাষী বহু মুসলিম পণ্ডিতকে কুরআনের ভাষা অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী আরবি মুসলিম সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভাষা ছিল। কুরআন মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক, উৎস এবং কাঠামোয় পরিণত হয়েছে।

ইসলাম ভৌগোলিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের এক বিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। নানা ধরনের মানুষ ও সংস্কৃতির প্রয়োজন মেটাতে এটি নিজেকে প্রয়োজনমতো খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় তা বহু ও ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র বিচিত্র চরিত্র এবং অভিব্যক্তিকে ধারণ করেছে। কুরআন এই মহাবৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দেয় এবং সালাতের অনুশীলন, সাহিত্যিক অভিব্যক্তি এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে মৌলিক ঐক্য সঞ্চার করে। এই আপাতবিরোধী ঐক্য

ও ইসলামের বৈচিত্র্যময়তা এবং কুরআনে এর ভিত্তিই এর অন্তর্নিহিত শক্তি। মানব-পরিবারের ঐক্যের নীতি কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি: ''হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।'' [সূরা নিসা, আয়াত ১] বৈচিত্র্যের নীতি পবিত্র কুরআনেরও নীতি; জাতি, বর্ণ ও মতবাদের পার্থক্য আল্লাহর তরফ থেকেই পূর্বনির্ধারিত।

পবিত্র কুরআন জ্ঞান ও মানবিক প্রচেষ্টার প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎস হয়ে আছে। কুরআন সর্বকালে, সব পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য এক শাশ্বত মহাগ্রন্থ। প্রতিটি মুসলমানই কুরআন পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন।♦

তথ্যসূত্র

1. Ayoub, Mahmoud. *The Qur'an and Its Interpreters,* 2 vols. to date. New York: State University of New York Press, 1984.
2. Izutsu, T. *God and Man in the Koran.* Tokyo: Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 1964.
3. Kassis, H.E. *A Concordance of the Qur'an.* Berkeley: University of California Press, 1983.
4. Lings, M. *The Qur'anic Art of Calligraphy and Illumination.* Boulder: Shambhala, 1976.
5. Nelson, K. *The Art of Reciting the Qur'an.* Austin: University of Texas Press, 1985.
6. Safadgi, Y.H. *Islamic Calligraphy.* Boulder: Shambhala, 1978.
7. Tabari, al. *The Commentary on the Qur'an.* Vol. 1, New York: Oxford University Press, 1987
8. Tabatabai, M.H. *The Qur'an in Islam: Its Impact and Influence on the Life of Muslims.* London: Muhammadi Trust, 1987.

বঙ্গবন্ধুর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসাম্প্রদায়িক চরিত্র'- সকল সংশয়, বিতর্ক ও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে, যদিও বা ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতি শুরু করেছিলেন প্রথমত: মুসলিম ছাত্রলীগ এবং পরবর্তীতে মুসলিম লীগে যোগদানের মাধ্যমে। '৪৭-এ দেশ ভাগের পূর্বে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক সহকর্মীদের নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ ও আক্রান্ত মানুষদের রক্ষা, সাহায্য ও পুনর্বাসনে কিভাবে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন তার বিবরণ তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে (পৃ:৬৩-৭১) বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয়ের পরে যেদিন তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন সেদিনেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ইন্ধনে আদমজীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো হলে বঙ্গবন্ধু সেখানেও ছুটে গিয়েছিলেন দাঙ্গা প্রতিরোধে। ৬০/৭০ দশকে বিভিন্ন সময়ে পুরানো ঢাকায় বারংবার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি করা হলে বঙ্গবন্ধু সব

সময়ে দাঙ্গা আক্রান্ত এলাকায় উপস্থিত হয়ে মানুষের জান-মাল রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। আর এসব করতে গিয়ে তিনি দাঙ্গাকারীদের দ্বারা আক্রান্তও হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে গ্রহণ করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহন করায় স্বাধীনতা'র পরাজিত ধর্মব্যবসায়ী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যারা বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন ও সংগ্রামকে ইসলাম ধর্ম-কে 'বর্ম' হিসেবে ব্যবহার করে বাধাগ্রস্ত করার হীন অপচেষ্টা চালিয়েছিল, তাদের অব্যাহত প্রচারণা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে একটি ইসলাম ধর্মহীন হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে; শেখ মুজিব ভারত ও হিন্দুদের এজেন্ট; বাংলাদেশের মসজিদগুলি বন্ধ করে আযান দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাস্তব সত্য এটাও যে, ধর্মান্ধগোষ্ঠীর প্রচারণার কারণে সৌদি আরব-সহ বেশ কিছু মুসলিম দেশসমূহ বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত ছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন ও চর্চা করতেন, ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি ইসলাম ধর্মে ও মহান আল্লাহর উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। আবার ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল- অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ়।

ঈদে মিলাদুন্নবী দিবসের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলছেন ঃ
ধর্ম নিয়ে আর ব্যবসা করা চলবে
সর্বত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়েছে

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হচ্ছে

'৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন- 'জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামীলীগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে পবিত্র কোরআন ও সুন্নায় সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশাবলীর পরিপন্থী কোন আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না। শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি সন্নিবেশিত হবে। সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, তবলীগ জামাতের জন্য জায়গা প্রদান, মদ-জুয়া, ঘোড় দৌড় বন্ধ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণই প্রমাণ করে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা।

বঙ্গবন্ধু ধর্ম বিশ্বাস থেকে তিনি তাঁর বক্তব্য-বিবৃতিতে প্রায়শঃই 'ইন্‌শাআল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহার করতেন- আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষনে তাঁর বজ্রকঠিন ঘোষণা ছিল- 'এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ্'।

২৮ অক্টোবর '৭০ সালে পাকিস্তান টেলিভিশন ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালায় বঙ্গবন্ধু বক্তব্য শেষ করেন এভাবে- 'আওয়ামীলীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো'।

'৭০-এর নির্বাচনের পূর্বে ১ ডিসেম্বর এক নির্বাচনী আবেদনে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন'। ২৬ মার্চ '৭২ আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন বাংলার স্বাধীনতা হরন করার শক্তি তাদের নাই; ইন্‌শাআল্লাহ্ আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন'। ৯ মে '৭২ রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ আবার দেখা হবে। আপনারা কাজ করুন। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, আমার সোনার বাংলা গড়ে তুলবো'। ১০ মে '৭২ পাবনার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মানুষকে সাহায্য করতে হবে। বিজয় নিশ্চিত বন্ধুরা। আবার দেখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্'। ৭ জুন '৭২ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'শ্রমিক ভাইয়েরা, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু উৎপাদন করো। আল্লাহর ওয়াস্তে মিল খেয়ে ফেলো না। আমি এবার তাহলে চলি। খোদা হাফেজ'। ৩ জুলাই '৭২ কুষ্টিয়ার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌ যদি আপনারা ৩ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে বাংলার মানুষ আশা করি পেট ভরে ভাত খাবে। ....। আপনার আমার সাথে দোয়া করেন সে সমস্ত লোক, আমার ভাইয়েরা শহীদ হয়েছে এই যুদ্ধে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আপনারা মোনাজাত করেন আমার সাথে। আল্লাহু আকবার'। ৪ জুলাই '৭২ কুমিল্লার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আর সে সমস্ত ভাই, যে সমস্ত বোন, যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, তাদের আমার মাগফেরাত কামনা করে আমার সঙ্গে মোনাজাত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন. . . । বহুক্ষণ আপনারা কষ্ট করেছেন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ বেঁচে থাকলে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন ঈমানের সঙ্গে রাখে, আর আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি'। '৭২ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তবুও যাদের দোয়ায় আমি ফিরে এসেছি এবং আল্লাহ্‌ যেন তৌফিক দেয় তাদের সাথে যেন আমি মরতে পারি। তাদের পাশে পাশেই থাকতে পারি এবং তাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি'। ৩রা জানুয়ারী বরগুনার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'জীবনে যা কোনোও মানুষ পায় না, তা আমি পেয়েছি। সে হলো আপনাদের ভালোবাসা। এই ভালোবাসা নিয়েই আল্লাহর কাছে আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আপনাদের এই ভালোবাসা নিয়ে আমি যেন মরতে পারি'। ১২ ফেব্রুয়ারী '৭৩ টাংগাইলের নির্বাচনী জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তবে একটা কথা হলো এই আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আল্লাহ্‌ যেন আমাকে ঈমানের সঙ্গে রাখেন'। ১০ ডিসেম্বর '৭৪ চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ আমাদের সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করে সোনার বাংলা গড়ে তোলাা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। . . . . . । ইন্‌শাআল্লাহ্‌ বাংলার সম্পদ এখন থেকে বাংলারই থাকবে। জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর '৭৪ প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা যদি বাংলার সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলি-বন্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কল-কারখানায়, ক্ষেতে-ময়দানে উৎপাদন বাড়াতে পরি; তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের ভাবী বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী, ও সমৃদ্ধিশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারবো'। ২৫ জানুয়ারি '৭৫ জাতীয় সংসদে বাকশালের নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে

গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন- 'তাই, আল্লাহর নামে, চলুন, আমরা অগ্রসর হই। 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমরা কামিয়াব হবই। খোদা আমাদের সহায় আছেন। . . . . . । যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির নাজির করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌' বলে কাজে অগ্রসর হন, তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে। বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে; জনগনকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমরা কামিয়াব হবই'। ৮ মার্চ '৭৫ টাংগাইলের কাগমারীতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তবু আসছি, কারণ বহুদিন আপনাদের সাথে দেখা হয় না। আপনারা আমাকে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন ভালো রাখে'।

বঙ্গবন্ধু নিজের ধর্ম পালন সম্পর্কে লিখেছেন-'আমি তখন নামাজ পড়তাম এবং কোরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজী তরজমাও পড়েছি (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ-১৮০)। ৪ নভেম্বর '৭২ গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য শেষে বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব করেন, অধিবেশনের সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে যেন মাওলানা তর্কবাগীশ সাহেব মোনাজাত করেন। মাননীয় স্পীকার তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে মোনাজাতের মাধ্যমে সেদিন অধিবেশন শেষ করেন।

রাজনীতিতে ধর্ম-কে ব্যবহার করে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হীন প্রচেষ্টা এবং ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রচারণার জবাবে বঙ্গবন্ধু ২৮ অক্টোবর '৭০ রেডিও থেকে প্রচারিত বক্তৃতায় বলেছিলেন- '৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসুচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষ বারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামে নীতির পরিপন্থী কোন আইনই এ দেশে পাস হতে পারে না, চাপিয়ে দেয়া হবে না'।

'৭০-এ সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছিলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য- 'লেবেল-সর্বস্ব ইসলামে

আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইন্‌সাফের ইসলামে, যে- ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যাঁরা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাশের কথা ভাবতে পারেন কেবল তাঁরাই ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়সা করে তোলার কাজে'।

ধর্মের অপব্যবহার নিয়ে বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধি-'মানুষ যদি সত্যিকারভাবে ধর্মভাব নিয়ে চলতো তাহলে আর মানুষে মানুষে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এইভাবে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম হতো না। কিন্তু মানুষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ধর্মের অর্থ যার যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চালাতে চেষ্টা করেছে। সেই জন্য একই ধর্মের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। ধরুন রাসূলে করিম (সা) ইসলাম ধর্মকে যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন সেইভাবে যদি ধর্ম চলতো তাহা হলে আজ আর মানুষে মানুষে এ বিরোধ হতো না। কিন্তু সেই ইসলাম ধর্মের মধ্যে কত বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুন্নি, শিয়া, কাদিয়ানি, ইসমাইলি, আগাখানি, আবার মোহম্মদি, ওহাবি, কত রকমের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এই ধর্মের মধ্যে। এর অর্থ কী? আমরা দেখতে পেয়েছি শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরাই একে অন্যের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে নাই। শিয়া সুন্নি দাঙ্গার কথা আপনারা জানেন, হাজার হাজার মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করেছে। আপনারা এও জানেন, কাদিয়ানি-শিয়া-সুন্নিদের সাথে পাঞ্জাবে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে তার নজির বোধ হয় ইতিহাসে বিরল। এর কারণ কী? আজ ধর্ম কোথায়? আর যারা আমাদের ধর্মের গুরু তাদের অবস্থা কী? একবার চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আমাদের দেশে এককালে এই সকল তথাকথিত ধর্মগুরু বা পীর সাহেবরা ইংরেজি পড়া হারাম বলে আমাদের জাতির কী ভয়ানক ক্ষতি করেছে। সৈয়দ আহমদ যখন ইংরেজি পড়ার জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করলেন তখন তাঁকে এই সকল পীর সাহেবরা ফতোয়া দিলো 'কাফের' বলে। জিন্নাহ সাহেব যখন পাকিস্তানের আন্দোলন শুরু করলেন তখন এই সমস্ত পীর সাহেবরা কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে কী জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার প্যামফ্‌লেট কংগ্রেসের টাকা দিয়া ছাপাইয়া দেশ বিদেশে বিলি করেছিল। ইসলামের নামে তারা কোরআন ও হাদিস দিয়া প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করতো যে পাকিস্তান দাবি করা, আর কোরআনের খেলাফ কাজ করা একই কথা।' (আমার দেখা নয়াচীন, পৃ: ১০৮-১০৯)। ২১ ফেব্রুয়ারি '৫৬ পাকিস্তান গণপরিষদের এক অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছিলেন 'Let Pakistan be a pure and simple Pakistan of the People. Do not try to hoodwink the people of Pakistan in the name of Islam……| Islam is for the good of the humanity: As a Mussalman, I believe in my religion and it is my duty to obey it. Allah will punish me for my faults. In there anywhere that the government will punish me if I do not say parayers five times a day? Is there in the Holy Quran, Can you show me? I think there is nowhere mentioned that the Government will punish me and put me in jail if I do not say my prayers. It is my new charecter and my own personal matter'।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, '৫৪-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু'র বিরুদ্ধে শর্ষিনার পীর সহ দেশের বেশ কিছু সংখ্যক পীর এবং আলেম ধর্ম সভা ডেকে ফতোয়া দিয়েছিলেন, শেখ মুজিবকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী-২৫৬)।

১০ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে বলেছিলেন, 'সকলে জেনে রাখুন-বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ।.....। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্টভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশে কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকুক'।

১০ এপ্রিল '৭২ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত প্রস্তাব- '.....। এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার সেই সব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে'- সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়'।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ধর্মব্যবসায়ীগোষ্ঠীর নানা সমালোচনা ও বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গণপরিষদসহ বিভিন্ন ভাষণে বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। ৪ নভেম্বর '৭২ গণপরিষদে সংবিধান-বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম কর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে

ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।....। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে-তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে-কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে-তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না। খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে-কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার-এই বাংলাদেশের মাটিতে এ সব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব-ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি'।

৯ মে '৭২ রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেয়া হবে না। পশ্চিমারা ২৩ বছর ইসলামিক ট্যাবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে। আপনারা জানেন? খবর রাখেন? এই বাংলা থেকে ২৩ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা পশ্চিমারা আমার কৃষকের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে'।

২৬ জুন '৭২ মাইজদি কোর্টের জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। তার অর্থ ধর্মবিরোধী নয়। এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর অত্যাচার করবে না। ধর্মের নামে জুয়াচুরি, পকেটমার লুটতরাজ, ব্যবসা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পয়সা খাইয়া রাজনীতি করা চলবেনা। ধর্মের নামে রাজনীতি চলবে না। ধর্মের নামে লুট করা চলবে না। তবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান হিসেবে আমার ধর্ম-কর্ম পালন করবো। হিন্দু হিন্দুধর্ম পালন করবে। কেউ ধর্মকর্মে বাধা দিবার পারবে না। ঠিক? মানেন? আমার ধর্ম আমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমার কুরআনের আয়াতে আছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমার ধর্ম আমার কাছে, এইটাই হলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র'।

৩ জুলাই '৭২ কুষ্টিয়ার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '....। কিন্তু ঐ ধর্মের নামে রাজাকার, ধর্মের নামে আলবদর, ধর্মের নামে আলসামস্ আর ধর্মের নামে ব্যবসা করতে বাংলাদেশের জনসাধারণ দেবে না, আমিও দিতে পারবো না।

কারণ এই ধর্মের নামে পশ্চিমারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে। আমার দেশকে লুট করেছে। আমার সংসার খতম করেছে, আমার মানুষকে গৃহহারা করেছে। সে জন্য এ রাষ্ট্র চলবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেমন চলে'।

১৮ জানুয়ারী '৭৪ আওয়ামীলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,- 'রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক-তারা হীন, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোন দিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আল-আমীন-রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিষ্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক-সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে সমান। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। আওয়ামীলীগের কর্মীরা, তোমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে হবে-যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে'।

বঙ্গবন্ধুকে নির্মম ভাবে হত্যার পর প্রথমে সামরিক ফরমান বলে, পরবর্তীতে তথাকথিত ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাসহ অন্যান্য মূলনীতির উপর আঘাত আনা হয়। দেশকে পাকিস্তানী ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসমূহ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত রাজাকার-আল্‌বদরদেরকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবে পুনর্বাসন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। সুপ্রীম কোর্ট ৫ম সংশোধনী অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করায় এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ এখন আবারো সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ হিসেবে এগিয়ে চলছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে দেশের কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হোক ২৬ মার্চ '৭৫ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় ও গভীর প্রত্যয়- 'ইন্‌শাআল্লাহ, বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে'।♦

লেখক : বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

বঙ্গবন্ধুর রাখা ঐতিহাসিক নাম শেখ রাসেল

মিলন সব্যসাচী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। প্রকৃত নাম শেখ রিসালউদদীন। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে বঙ্গমাতার কোল আলোকিত করে শেখ রাসেলের জন্ম হয়। চারিদিকে বয়ে যায় অনাবিল আনন্দের বন্যা। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দুটি বোন রাসেলকে অনেক আদরে বুকে আগলে রাখতেন। পরিবারসহ স্বজনদের নয়নমণি ছিলেন শেখ রাসেল। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেলের নামে পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার নাম রেখেছেন রাসেল। ঐতিহাসিক শেখ পরিবারের ঐতিহ্যের আলোয় আলোকিত করতে নামের আগে

শেখ শব্দটি যোগ করা হয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে তিনি বড় হতে লাগলেন, দুটি ডাগর চোখে ছিলো অন্তহীন স্বপ্ন। তার বড় বোন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কে রাসেল বুবু বলে ডাকতেন, রেহানাকে রেয়না আপুই ডাকতেন। রাসেলকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনেক আদর করতেন। তার যতো বায়না সবই বলতেন হাসু বুবুর কাছে। বুবুও তার সব আবদার পূরণ করতেন। বুবুর হাত ধরে হাঁটতেন। অসুস্থ হলে বুবু সারারাত পার করে দিতেন রাসেলের মাথার কাছে বসে। ছোট্ট ভাইটি কখন সুস্থ হবে। বত্রিশ নম্বরের এই বাড়িটি মাতিয়ে রাখতেন শেখ রাসেল। কখনও ছুটতেন প্রজাপতির পিছু পিছু কখনও আবার মপেট সাইকেল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গী করে তুমূল হই হুল্লুড়ে মেতে উঠতেন।

বাবার হাত ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন আর খেলাধুলায় মেতে উঠতেন। আমাদের দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ রাসেল সম্পর্কে লিখেছেন, 'রাসেল আমাদের সবার বড় আদরের। সবার ছোট বলে ওর আদরের কোনও সীমা নেই। ও যদি কখনও একটু ব্যথা পায় সে ব্যথা যেনো আমাদের সবারই লাগে। আমরা সব ভাই-বোন সব সময় চোখে চোখে রাখি। ওর গায়ে এতটুকু আঁচড়ও যেনো না লাগে। কী সুন্দর তুলতুলে একটা শিশু। দেখলেই মনে হয় গালটা টিপে আদর করি। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসায় আমার শোয়ার ঘরে। দোতলা তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করেছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নিচ তলায় আমরা থাকি। উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিলো রাত দেড়টায়। আমরা ভাইবোন সব সময় ওকে হাত ধরে হাঁটাতাম। একদিন আমার হাত ধরে হাঁটছে। ওর যেন হাঁটার ইচ্ছা খুব বেড়ে গেছে। সারা বাড়ি হাত ধরে ধরে হাঁটছে। হাঁটছে হাঁটছে পেছনের বারান্দা থেকে সামনের বারান্দা হয়ে বেশ কয়েকবার ঘুরল। এই হাঁটার মধ্যে আমি মাঝে মাঝে চেষ্টা করছি আঙুল ছেড়ে দিতে, যাতে নিজে হাঁটতে পারে। কিন্তু সে বিরক্ত হচ্ছে, আর বসে পড়ছে, হাঁটবে না আঙুল ছাড়া। চলাফেরায় বেশ সাবধানী কিন্তু সাহসী ছিল, সহসা কোনও কিছুতে ভয় পেত না। কালো কালো বড় পিঁপড়া দেখলে ধরতে যেত। একদিন একটা বড় ওল্লা (বড় কালো পিঁপড়া) ধরে ফেলল আর সাথে সাথে কামড় খেল। ছোট্ট আঙুল কেটে রক্ত বের হলো। সাথে সাথে ওষুধ দেয়া হলো। আঙুলটা ফুলে গেছে। তারপর থেকে আর পিঁপড়া ধরতে যেত না। কিন্তু ওই পিঁপড়ার একটা নাম নিজেই দিয়ে দিল। কামড় খাওয়ার পর থেকেই কালো বড় পিঁপড়া দেখলেই বলত 'ভুট্টো'। নিজে থেকেই নামটা দিয়েছিল। রাসেলের কথা ও কান্না টেপ রেকর্ডারে টেপ

করতাম। তখনকার দিনে বেশ বড় টেপ রেকর্ডার ছিল। ওর কান্না মাঝে মাঝে ওকেই শোনাতাম। সব থেকে মজা হতো ও যদি কোনও কারণে কান্নাকাটি করত, আমরা টেপ ছেড়ে দিতাম, ও তখন চুপ হয়ে যেত। অবাক হতো মনে হয়। আমাদের বাসায় আম্বিয়ার মা নামে এক বুয়া ছিল, খুব আদর করত রাসেলকে। কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খাবার খাওয়াতো। রাসেলের একবার খুব বড় অ্যাকসিডেন্ট হলো। সে দিনটার কথা এখনও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। রাসেলের একটা ছোট মপেট মোটরসাইকেল ছিল আর একটা সাইকেলও ছিল। বাসায় চালাত, কখনও রাস্তায় সাইকেল নিয়ে চলে যেত। পাশের বাড়ির ছেলেরা ওর সঙ্গে সাইকেল চালাতো। আদিল ও ইমরান দুই ভাই এবং রাসেল একসঙ্গে খেলা করত। একদিন মপেট চালানোর সময় রাসেল পড়ে যায় আর ওর পা আটকে যায় সাইকেলের পাইপে। বেশ কষ্ট করে পা বের করে। আমি বাসার উপর তলায় জয় ও পুতুলকে নিয়ে ঘরে ছিলাম। হঠাৎ রাসেলের কান্নার আওয়াজ পাই। ছুটে উত্তর-পশ্চিমের খোলা বারান্দায় চলে আসি, চীৎকার করে সবাইকে ডাকি। এর মধ্যে দেখি কে যেন ওকে কোলে নিয়ে আসছে। পায়ের অনেকখানি জায়গা পুড়ে গেছে। বেশ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার এসে ওষুধ দিল। অনেকদিন পর্যন্ত পায়ের ঘা নিয়ে কষ্ট পেয়েছিল। এর মধ্যে আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাশিয়া যান চিকিৎসা করাতে।

জেলখানায় আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে আর আসতে চাইতো না। খুবই কান্নাকাটি করত। ওকে বোঝানো হয়েছিল যে আব্বার বাসা জেলখানা, আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাব। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফেরত আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাতো এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন। মাকেই আব্বা বলে ডাকতো। জয় যখন জন্ম নেয় রাসেল তখন খুব ছোট, সে জয়ের পাশে বসে থাকত। যখন উড়োজাহাজ যেত অনেক শব্দ হতো। রাসেল সব সময় পকেটে তুলো রাখত জয়ের কানে গুজে দেয়ার জন্য। গাড়ি নিয়ে খেলত যখন জয় গাড়ি চাইতো রাসেল চকলেট দিয়ে থামাত। গ্রামের বাড়িতে তার বন্ধুও ছিল অনেক। তার সেই ক্ষুদে বাহিনীর সাথে খেলত। ঢাকা থেকে ওদের জন্য জামা কাপড় কিনে নিয়ে যেত। ফুফাতো ভাই আরিফ তার খুব ভালো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তারা দু'জন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়ত এবং একসঙ্গে খেলত। টুঙ্গিপাড়ায় তাদের একটা খুদে বাহিনী ছিল, যাদের সঙ্গে খালের পানিতে সাঁতার কাটত, ফুটবল খেলায় মেতে

থাকত তারা। টুঙ্গিপাড়া যাবার আগে আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের রাসেলের ক্ষুদে বাহিনীর জন্য কাপড়, চকলেট কিনে দিতেন। চাচা রাসেলের সব আবদার রাখতেন। রাসেল খুব মজা করে জয়-পুতুলকে নিয়ে খেলত। আমি জার্মানি যাওয়ার সময় রেহানাকে আমার সাথে নিয়ে যাই। রাসেলকে সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওর জন্ডিস হয়, শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। সে কারণে মা ওকে আর আমাদের সাথে যেতে দেননি। রাসেলেকে সেদিন আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে ওকে আর হারাতে হতো না।'

পিতা বঙ্গবন্ধুর কোলে আদরের শেখ রাসেল

রাসেলের সম্পর্কে শেখ রেহানা লিখেন, 'আমাকে দেনাপা বলে ডাকত প্রথমে পরে রেয়না আপা ডাকত। জার্মানিতে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে রাসেলের জন্য খেলনা ও জুতো কিনেছিলাম, সেগুলো এখনও আমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে আছে। আমি রাসেলকে একটা চিঠি লিখে পোস্ট করেছিলাম, রাসেলের হাতে তা পৌঁছেনি। পঁয়ত্রিশ বছর পরে সে চিঠি আমার হাতেই ফিরে আসে। রাসেলকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে কখনো কল্পনা করিনি। আজো রাসেল আমার চোখে সেই দশ বছরের ভাইটি রয়ে গেছে। ওই বয়সের কাউকে দেখলে আমার চোখে রাসেল ভেসে ওঠে। আমার ছেলে ববি জন্ম নেবার পর ওকেও আমি অনেকদিন রাসেল বলে ডেকেছি। আমার আজো সেই কবিতার লাইনটি মনে পড়ে 'সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল সেই।' ভাবতেই আমার কষ্ট লাগে যে, আজ রাসেল নেই। রাসেলকে আর দেখতে পাব না। রেহানা আপু বলে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে না। কী অপরাধ ছিল তার? মাত্র দশ বছরের পবিত্র এক শিশু ছিল।

রাজনীতি কী, ও কি বুঝত? রক্ত দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলতো। গোলাগুলির শব্দ শুনলে মাকে জড়িয়ে ধরত, বুকের ভেতর কষ্ট চেপে রাখত সেই রাসেল সবার রক্ত দেখে দেখে তারপর নিজের রক্ত দিয়ে গেলো। এই রক্তাক্ত দৃশ্য সে কেমন করে সহ্য করেছিল? রাসেল আমাদের ব্যথা, আমাদের শোক এবং আমাদের ভালোবাসা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে। জাতির পিতাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যখন হত্যা করতে থাকে। একে একে তখন চোখের সামনে সে দেখেছে বাবা, মা ভাই ভাবি চাচাসহ সবাইকে খুনিচক্র গুলি করে মারছে। কী নৃশংস কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য। ছোট্ট রাসেল কী করেছিল তখন! ভয়ে আতংকে যখন বলেছিল, আমি মায়ের কাছে যাব খুনিচক্র তখন বলেছিল, চলো মায়ের কাছে দিয়ে আসি। তার ভেতরের আত্মা শুকিয়ে আসছিল। তাকে তার মায়ের কাছেই পাঠিয়েছিল তারা। তবে প্রাণহীন একটি দেহ। তাদের ভাষা হয়তো সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু খুনিরা অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে তুলেছিল বত্রিশ নাম্বর বাড়িটি। ভোররাতে নিষ্ঠুর খুনিচক্র সেই মাসুম বাচ্চার বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী আজো কতোটা দুঃখ বুকে চেপে আছেন। গোটা পরিবারকে হারিয়ে তিনি তাঁর অতি আদরের ছোট্ট ভাইটিকেও হারিয়েছেন। সেদিন কেঁদেছিল বাংলাদেশ শুধু কাঁদেনি খুনিদের মন। সেই খুনিদের কয়েকজন শাস্তি পেয়েছে। তাদের বিচার হয়েছে ।

যদি ইতিহাসে ১৫ আগস্ট না আসতো তাহলে এতদিনে আমরা অন্য এক বাংলাদেশ আর রাসেলকে পেতাম তারুণ্যের অহংকারের প্রতীক হিসেবে। সেই ছোট্ট চোখে মুখে তার অবয়বে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ফুঁটে উঠেছিলো। খুনিচক্র এটি নিশ্চয় অনুধাবন করেছিল যে এই শিশুটি বেঁচে থাকলে তাদের যে নৃশংসতা তার জবাব সেই দিবে। কালের সাক্ষি হয়ে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী মোহিতুল ইসলাম এর মুখেই শোনা গিয়েছিল রাসেলের সেই আকুতি 'আল্লা'র দোহাই আমাকে জানে মেরে ফেলবেন না। আমার হাসু আপা দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানীতে আছেন। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আপনারা আমাকে জার্মানীতে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি মায়ের কাছে যাবো আমাকে মায়ের কাছে যেতে দিন'। মৃত্যুর আগে খুনিদের কাছে এই আকুতি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের। তবে সেদিন রাসেলের এই আর্তচীৎকারে খোদার আরশ কেঁপে উঠলেও টলাতে পারেনি খুনী পাষাণদের মন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতো এই নিষ্পাপ শিশুকেও ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিলো। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে রাসেলকে হত্যার এই নৃশংস বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লেখেন বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যার পর রাসেল দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকজনের কাছে

আশ্রয় নেয়। রাসেলের দীর্ঘকাল দেখাশুনার দায়িত্বে থাকা আবদুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিলেন। একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কথা বলে রমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেয়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে তাকে না মারার জন্য আল্লাহ'র দোহাই দেয়। রাসেলের এই মর্মস্পর্শী আর্তিতে একজন সৈন্যের মন গলায় সে তাকে বাড়ির গেটে সেন্ট্রিবক্সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এর প্রায় আধ ঘণ্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতলায় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে'।

তিনি বেঁচে থাকলে ৫৩ বছরের একজন উদ্যমী নেতা হতেন। সে সময় শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। সজিব ওয়াজেদ জয় যেমন আমাদের আশা ভরসার প্রতীক হয়ে উঠছেন তেমনি শেখ রাসেলও বেঁচে থাকলে আমাদের প্রেরণার উৎস হতেন। তিনি আমাদের অস্তিত্বে রবেন চিরকাল। শোক আজ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বনানী থেকে তিনি আমাদের উজ্জীবিত করছেন। শোকের সেই ছাঁইচাপা আগুন জ্বলন্ত লাভার মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শেখ রাসেল আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তার আলোকরশ্মি আমাদেরকে পথ দেখায়। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা তাকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। শহীদ শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর, তরুণ, শুভবুদ্ধি বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে ভালোবাসার নাম। জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমী প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার সিংহাসনে রাসেল আছেন এবং থাকবেন চিরোদিন। কবিদের কাব্যে, শিল্পীর গানে, চিত্রকলায় রাসেল প্রিয়মুখে ফুটে উঠছেন নিত্য নতুন ক্যানভাসে। রাসেল, রাসেল, ডাকি ফিরে আসে একটি শিশুর মৃত্যুলাশ। বেঁচে থাক বাংলাদেশ, রাসেল সাব্বাস। পদদলিত হোক ঘৃণ্যঘাতক, খুনিরা ও কুচক্রিরা। জয় হোক মুক্তিকামী মানুষের। ♦

ক | বি | তা

তোমার নামের পরশ

খালেক বিন জয়েনউদদীন

তোমার নামের পরশ পৃথিবীর সকল গাছের পাতায়
নদীর ছলছল পানির ঢেউয়ে, সাগরের অতল স্রোতে
মাঠ-প্রান্তর, ঘর-বাড়ি ছুঁয়ে পর্বত-পাহাড়ের টিলায়
সীমাহীন সেই স্পর্শে আজো সজীব শ্যামল প্রকৃতি।

তোমার নামের অনির্বাণ দ্যুতি আঠারো হাজার সৃষ্টির
আকুল প্রাণে কেবলই ছড়ায় ক্লান্তিহীন দিব্য আলো
দিগ-দিগন্তে জ্বলে নক্ষত্রের কোটি কোটি শিখা
তখনই অসত্যের দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ে অকস্মাৎ।

আমরাও তোমার নামের পুলকে বৈভব বিভায়
রোগ-শোক-বেদনার মধ্যেও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি।

প্রয়োজন প্রিয়জন

প্রত্যয় জসীম

প্রয়োজন... প্রিয়জন কিছু না আমি...
এ জীবন মূল্যহীন তুচ্ছ কম দামী।
প্রিয়জন... প্রয়োজন খুঁজি একা একা...
পাশাপাশি কাছাকাছি কিছুকাল থাকা।
প্রভূ একা আমি একা– একা প্রাণমাঝি...
আমি আর মাঝি– জীবনের মাঝামাঝি।

প্রয়োজন নাকি প্রিয়জন বুঝিনাতো আমি...
ভালোবাসা ছাড়া জানি– সব কম দামী।

অপমান অবহেলা নত মুখে সই...
হাসি কাঁদি-ঘুরি ফিরি মরে বেঁচে রই।
সুখে দুঃখে প্রিয়জন কত প্রয়োজন?
প্রয়োজন... প্রিয়জন কে'কার স্বজন।

ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল

আনোয়ার কবির

ব্যাগ্র ব্যাকুল প্রতীক্ষায় মানবকূল
ধূলির ধরায় অপেক্ষমাণ সৃষ্টিকূল
স্রষ্টার অপার করুণায় রহমতের রাসূল
ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল।

নিপীড়ন নির্যাতন অবসানের শুভ বার্তা
অন্ধকার অবসানের আলোর বার্তা
ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল।

আল্লাহর পেয়ারের বন্ধু কল্যাণের পরশ
সকল ভুবনের অপার শান্তির পরশ
ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল

দ্বীন দুনিয়ার কাণ্ডারের তরী
ইহকাল পরকাল জীন ইনসানের মুক্তির তরী
ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসূল।

বিশ্বনবী মোহাম্মদ রাসূল (সা)

আবুল হোসেন আজাদ

গোমরাহীতে পাপাচারে যখন আরব ভূমি
মুক্তিরই দূত বিশ্বনবী তখন এলে তুমি।
মক্কার বুকে মা আমিনার পবিত্র কোল জুড়ে
তুমি এলে তাই পালাল আঁধার যত দূরে।

তুমি এলে খুশির ছোঁয়ায় গাইল পাখি বাগে
নতুন আলোর উছল ধারায় ভোরের সূর্য জাগে।
তোমার জন্য আকাশ বাতাস চন্দ্র গ্রহ তারা
সাগর পাহাড় ঝর্ণাধারা সবাই পাগল পারা।

তুমি এসে পাক কলেমার দিলে যে দাওয়াত
তাই তো হলো দূরিভূত অহমিকা সংঘাত।
তোমার জন্য দ্বীন ইসলামের শীতল ছায়া তলে
কুফুরী পাপ ছেড়ে এলো মানুষ দলে দলে।

সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নেই যে তোমার তুল
তুমি মহান বিশ্বনবী মোহাম্মদ রাসূল (সা)।

আঁকি তোমার বৈচিত্র্য ছবি

শেখ দুলাল

হে জলধি
তুমি কোথায় থেকে এসেছো
তুমি কোথায় চলে যাও
তোমার উত্থান-পতন কোথায়?
একটু বলো শোনি ভাই।
আমি কবি
আঁকি তোমার বৈচিত্র্য ছবি
সবুজ-শ্যামলিমার ঘাসের হাওয়ায়
গভীর ভালোবাসা দিয়ে যাও-
কমল হাতছানি দিয়ে
স্বপ্নের রাঙা চোখ মেলিয়ে-
বষাতি-বর্ষায় আকাশে জাগিয়ে।
তুমি কার ডাকে সাড়া দাও
আকাশ বেয়ে পুনঃ কার ডাকে চলে যাও?
সাত সকালে তোমার রূপ দেখে আমি কবি হলাম
গভীর মুগ্ধ! কি আশ্চর্য সোনালী রূপের মতো
ঝকঝকে স্বচ্ছ কাচে ফুটে ওঠো মনোহরণী মায়াবী চমৎকার।
জোৎস্নাতি চাঁদের কিরণ?
হে কবি তবে শোনো
যে জন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন
সেজনই আমার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা
তাঁর ডাকেই আমি সবার শীর্ষে সাড়া দেই
কালো মেঘ হয়ে আকাশ বেয়ে আসি
পুনঃ বৃষ্টি রূপে জমিনে নেমে
মাঠ ঘাট নদী নালা বেয়ে চলি সাত সমুদ্দুর তের নদী দূরে
এটাই তার প্রকৃত ডাকে সাত সকাল সাজে
কখনো তার ডাকে রাত দুপুর বাজে
তারই সাঙ্গলীলা বাজে
বোঝেছো মহাকবি?
এখন একে যাও
আমার বৈচিত্র্যময় জীবনি ছবি।

আপনারই চরণধুলো মেখে

দেলওয়ার বিন রশিদ

এই ধরণী আপনারই চরণধুলো মেখে
হলো ধন্য
হলো পূতঃ পবিত্র
আপনারই চরণের ধুলো মেখে হলো দীপ্রমান
হলো স্নিগ্ধ শ্যামলিমা
ফুল ফসলে চির বহমান
আপনারই চরণধুলো মেখে
হলো ঐশ্বর্য্যপূর্ণ
সুন্দর সুষমাময়,

আপনারই চরণধুলো ছড়ায় কুসুম ঘ্রাণ
আপনারই চরণ রেখা ধরে
পথ হারা সব খুঁজে পায় আপন ঠিকানা,

অন্ধকারে আপনিই পথের প্রদীপ
পরম পাওয়া,
আপনি হে রাসূল হযরত মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,
আপনারই চরণধুলোয় ফোটে কুসুম,

আপনারই চরণের ধুলো মেখে
এ ধরণী হলো ধন্য
হলো স্নিগ্ধ সবুজাভ
ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, রূপময়।

রাসূলুল্লাহ প্রিয় তাই

গোলাম নবী পান্না

আধার যখন সখ্যতা পায় মত্ত হতে খেলায়,
সেই সে আধার ঘিরে যদি মিশি কালোর মেলায়।
তখন আলোর পরশ পেতে হাতছানি দেয় মন,
অপেক্ষাতে কাটে প্রহর উচাটন এক ক্ষণ।
কারণ আমি পথ ভুলে হই পথের পথিক ভোলা
উলুবুলু মনে কেবল হাজার রকম দোলা।
দোলাতো নয় যন্ত্রণার এক আড়াল করা দুখ,
কালো যেনো খাচ্ছে দিলে আলোর যত মুখ।
তখনও ও যে আলোর মানুষ খুঁজি আশে পাশে
ভান করা জনসংখ্যা তবু দাঁত কেলিয়ে হাসে।
এমন সময় আলোর পথের একটি নিশান বাকি
রাসূলুল্লাহ প্রিয় তাই, তাঁকেই ডেকে থাকি।

একাকিত্ব
কাওসার ফিরদৌসী

একাকিত্ব আমার জন্য
খুবই মূল্যবান।

একাকিত্বের গভীরতা
আমাকে অনেক কিছু শেখায়,

ভাবতে শেখায়–
ঈশ্বর আদি অনন্ত
যাবতীয় সৃষ্টির রহস্য

আমি বহুকাল নিজেকে খুঁজে পাইনি
লোকে– লোকারণ্যে,
নিজেকে ফেলেছিলাম হারিয়ে।

বার বার পথভ্রষ্ট নাবিকের মত
ভুল জায়গায় নোঙ্গর করেছি।

বিকিয়ে দিয়েছি
নিজের আত্মা সত্ত্বা ব্যক্তিত্ব
প্রতিবার প্রত্যাখাত হয়েছি, ছিটকে পড়েছি
দূর থেকে বহুদূরে–
ক্রিস্টালের মত
খণ্ডিত হওয়া নিজেকে
খুঁজে পাইনি বহুকাল!!

ছাড়পত্র

শামীম আহমেদ সৃজন

রহিমুল্লাহর ভাবনায় ছিল এটাই হয়তোবা বাবার শেষযাত্রা। কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়নি। এর আগেও বাবাকে বহুবার হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। একটু সুস্থ হলেই 'ছাড়পত্র' দিয়ে দেয়া হতো। এবারের অবস্থা খুবই খারাপ। বার্ধক্যজনিত কারণে যা হবার তাই।

প্রায় দশ বছর যাবতই বাবা অসুস্থ। পেশাব-পায়খানা প্রায়ই বিছানায় করেন। মা বাবার চেয়ে দশ বছরের ছোট; তাও চার বছর আগে মা-ই বাবাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

জমিলা বাড়ির বড় বউ। জমিলারই যেন সব দায় পড়েছে। বিছানায় পড়ে যাওয়ার পর মা-ই বাবাকে দেখতেন। সেই মা যখন চলে গেলেন, তখন উপায়! দায় সবই যেন বর্তালো জমিলার উপর। রহিমুল্লাহ অফিস থেকে এসে বাজার-ঘাট করেই যেন সব শেষ। তার হামকি-দুমকির শেষ নেই। ভাবটা এমন যেন এই নাহলে কী পুরুষ মানুষের মানায়! অবস্থাটা এমন যেন পুরুষ বাঘটা বসে বসে খায় আর বাঘিণীরই সব দায় শিকার করে এনে সবাইকে নিয়ে খায়। বাঘিণীর যেমন সবকিছুতেই পরে থাকে দায়।

জমিলা পরিমণিকে আনার জন্য সকাল এগারোটার দিকে একবার নির্ঝর স্কুলে যায়। এরই মধ্যে বাবার যদি মল-মূত্র ত্যাগ আবশ্যক হয়েই পড়ে তবে সবই বিছানায় সারা হয়। এ জমানায় পেম্পাস পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম পেম্পাস পড়ানো হতো। পেম্পাসের যা দাম। ১টি পেম্পাসের দাম প্রায় ১২০টাকা পড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবার। রহিমুল্লার এতটাকা প্রতিদিন যোগান দেয়া সম্ভব নয়। তদুপরি কখনও কখনও দৈনিক ২টি, ৩টি পর্যন্ত পেম্পাসও প্রয়োজন হয়। অগত্যা জমিলা শাড়ির আঁচল দিয়ে নাক-মুখ বেঁধে মালকোঁচা দিয়েই লেগে যান। অনেকটা দম বন্দ করে বাবার সব গলিজ পরিষ্কার করেন। বুয়া রহিমা, কখনও কখনও গরম পানি করে দিয়ে জমিলা ভাবীকে সাহায্য করেন। এতসবের কোনো কিছুতেই যেন রহিমুল্লার কোনোই দায় পড়ে না। রহিমুল্লাহ পাশের ঘরে বসে দিবসের পত্রিকাটি নাড়েন কিংবা অনেকটা শো ডাউনের মতো করেই পরিমণিকে অংক শেখাতে বসেন।

বাবা সবই বুঝতে পারেন। বউ মা বাবার শরীরের ময়লা সাফ করছেন। এতে বাবা ভীষণ লজ্জা পান। বুঝে-শুনেই বাবা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখেন। বাবা দু'হাত তুলে বউ মাকে দোয়া করেন, 'আল্লাহ! আমার বউ মাকে তুমি বেহেশত নসীব কইর'। বউ মা এতেই বড় তৃপ্ত হন। এ কাজগুলি যদি বড় ভাইয়্যা করতেন বাবা তাতে অনেকটাই স্বস্তিবোধ করতেন। বড় ভাইয়্যা এসবের ধারে কাছেই আসেন না।

আজ প্রায় পাঁচ বছর বাবার নিয়মিত নামায রোযা করা হয় না। মসজিদে যাওয়া বন্দ করেছেন, সেও প্রায় ছয়-সাত বছর। আগে ইশারায় নামায পড়তেন। অজুর পানির জন্য পরিমণি কিংবা বুয়া রহিমাকেই বলতেন। দুই বছর থেকে তাও বন্দ। নামায রোযা একদমই বন্দ হয়ে গেল। একদিন এক লোক বললেন, উনি এখন আল্লাহর কয়েদী। উনার বাদ যাওয়া নামায রোযার আর কাফফারা দিতে হবে না। সম্ভবমত দান-সদকা করে দিতে হবে। এটাই সন্তানদের উপর বর্তায়। ইতোমধ্যেই শরীরের একাংশ অবশ হয়ে গেছে। কিছুদিন আদদ্বীন হাসপাতালে রাখা হলো। আয়া-বুয়ারা ওসব কাজ ঠিকমত করেই না। অবশেষে দূর সম্পর্কের এক ভাগিনা চট্টগ্রাম থেকে একটি লোক ঠিক করে দিল। মাসিক বেতন চার হাজার টাকা। তার নাকি বাবা নেই। সে অনেকটা নিজের বাবার মতো করেই খেদমত করতেন। অশেষ নেকীর আশায়। তিনমাস পর সেও চলে গেল।

কলিম উদ্দীন ভরসার শেষ ভরসা জমিলা ভাবীই অবশিষ্ট রইল। কিন্তু জমিলা ভাবীও সবই আগের মতো ঠিকঠাক করতে পারে না। কারণ সে পাঁচ মাসের পোয়াতি। এদিকে বাবার অবস্থাও ক্রমেই আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। অগত্যা এবার বাবাকে নিকটবর্তী কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো

হলো। নতুন হাসপাতাল। চিকিৎসকদের আন্তরিকতার কোনোই কমতি নেই। খরচ-পাতিও আহামরি নয়। দুই মাসের মাথায় বাবা যেন অনেকটাই সুস্থ। না, একাকী চলতে পারেন না, ঠিকই তবে কারও সহযোগীতা পেলে মোটামুটি উঠে বসতে পারেন। ইশারায় নামাযও পরতে পারেন। তবে মাঝে-মধ্যেই বিছানায় পেশাব-পায়খানা হয়েই যায় বৈকি। এখানেও নার্স-আয়াদের সেবা যথেষ্ট নয়। জমিলা ভাবীর সেবাই যেন অনিবার্য। সেই জমিলা ভাবী পোয়াতি। তাতে কী! জটলা বেঁধেছে অত দূর থেকে বাসার সব কাজকর্ম ফেলে জমিলা ভাবী আগের মতো আর বাবার কাছে থাকতে পারেন না। ইতোমধ্যেই হাসপাতাল থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আগামী রবিবারেই বাবাকে রিলিজ করে দেয়া হবে।

অতি দ্রুতই যেন রবিবার এসে গেল। ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনে হাসপাতাল ঠাসা। চট্টগ্রাম থেক মেঝভাই, ভাবী বাচ্চাসহ এসেছেন। মীরপুর থেকে ছোটবোন তার স্বামীসহ এসেছেন। কালীগঞ্জ থেকে বড়বোন, দুলাভাই, নাতী-নাতনীরাও এসেছেন। খাগড়াছড়ি থেকে, ছোটভাই সৈনিক রবীন তিন দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন। বাবা আজ বড়োই উৎফুল্ল। সবার সাথেই বেশ হাসি-খুশী। দু'একটা কথাও বলছেন। সবার সাথে আনা খাবার হতে এটা ওটা কিছু কিছু খাচ্ছেন। জমিলা ভাবীর আনা স্যুপটাই নাকি তার বেশি ভালো লেগেছে; তাও বললেন। ছোট ছেলে রবীনের খাগড়াছড়ি থেকে আনা পেপে তার খুবই ভালো লেগেছে; তাও বললেন। এতসব নিকটজন একসঙ্গে দেখে বাবা বেশ খুশী।

মুহূর্তেই আকাশের সব রঙ বদলে গেল। ভেতরে ভেতরে প্রায় সবাই জানেন হাসপাতাল থেকে বাবাকে আর বাসাবোর বাসায় নেয়া হবে না। এ্যাম্বুল্যান্স রেডি। হাসপাতাল থেকেই বাবাকে সাভার জিরানী বৃদ্ধাশ্রমে নেয়া হবে। এটা সবাই জানে, জানেন না শুধু বাবা। জমিলা ভাবী এতে কিছুতেই রাজী না। একটু আড়ালে ডেকে বড় ভাইয়্যার হাত-পা ধরে কান্না জুড়ে দিল। 'বাবাকে আশ্রমে নিও না। যত কষ্টই হোক আমি বাবাকে দেখব'। রহিমুল্লাহ ভাইয়ার রাগ চরমে উঠে গেল। ভাবীকে জোড়ে এক ধমক! ভাবীর সব আকুতি যেন এক মুহূর্তেই নিভে গেল।

বড়বোন রাহেলা বললো, বাবাকে যখন বাসায় নিবি না, বৃদ্ধাশ্রমেই পাঠাবি, তবে বাবাকে বিষয়টা জানিয়ে দেয়াই ভালো। এতে সবাই সায় দিল। রাহেলা আপাই বাবার মাথার কাছে বেডের উপরে বসে বাবাকে বললো, 'বাবা! একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে এখান থেকেই সাভার একটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। ওখানে সরকার বৃদ্ধদের জন্য একটি নতুন হাসপাতাল তৈরি করেছেন। আমরা সবাই মাঝে মাঝেই ওখানে তোমাকে দেখতে যাব।' রাহেলা বুবুর মেয়ে নাফিসা মুখের উপরেই বলে দিল, হাসপাতাল

না, ছাই। নানা, উনারা তোমাকে জিরানী বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছেন। সবার অলক্ষেই বাবার চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল হাসপাতালের বেডের সাদা চাদরে গড়িয়ে পড়ল। জমিলা ভাবী তার শাড়ির আঁচল দিয়ে তা মুছে নিল। আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভাইয়ার আবার একটা কড়া ধমক। তখন ভাবীও নির্বাক। বাবা একবার ভাবীর দিকে তাকালেন। ভাবী বাবার মুখের কাছে মাথা রাখতেই বাবা ভাবীর মাথায় তার ডান হাত বুলিয়ে দিলেন।

ইতোমধ্যেই দুইজন নার্স 'ছাড়পত্র' নিয়ে এসেছেন। সাথে সাথে রবীন ও রহিমুল্লাহ ভাইও আছেন। অতি দ্রুতই সব গুছানো হয়ে গেছে। বাবাকে ট্রেচারে উঠানো হলো। এ্যাম্বুল্যান্সে রহিমুল্লাহ ভাই, রবীন, জমিলা ভাবীসহ আরও পাঁচ-ছয়জন সাধ্যমত উঠলেন। কালীগঞ্জ যেতে যেতে রাত হবে, তাই বড়বোন রাহেলা আর উঠলেন না। ট্রেচার থেকে নামিয়ে বাবাকে নির্দিষ্ট বেডের মাঝখানে শুইয়ে দেয়া হলো। গাড়ি দ্রুতই এগিয়ে চলছে জিরানী বৃদ্ধাশ্রমে।

রবিবার গাবতলী গরুর হাট। আজ যেন একটু বেশিই জমজমাট। হেমায়েতপুর, ব্যাংক টাউন, থানা রোড, সাভার বাজার, সাভার ডেয়ারী ফার্ম দ্রুতই সব পেরিয়ে গেল। সম্মুখেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ। জমিলা ভাবী একপাশে বাবার শিয়রে বসে আছেন। হঠাৎ বাবার বাহুতে হাত পড়লো। এ্যা কী! বাবার শরীর হিম শীতল কেনো! তাও ভয়ে কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করে ভাবী নিশ্চুপ থাকলেন। আরও কুড়ি মিনিট পর এ্যাম্বুল্যান্স এসে জিরানী বৃদ্ধাশ্রমের সামনে থামল। সবাই ধরাধরি করে বাবাকে আশ্রমের বারান্দায় নামাল। আশ্রমের কয়েকজন কর্মীরা অতি দ্রুতই ছুটে এল। শুরু হলো পরবর্তী কার্যক্রম। একজন নার্স বলে উঠল, 'এ্যকি! উনাকে এখানে নিয়া আইছেন কেনো? রায়হান ভাই বললো, 'কেনো? এখানে ভর্তি করাবো। গতকালই তো এসে সব ঠিকঠাক করে গেলাম।' তার আর দরকার নাই। কেনো? উনি তো মরে গেছেন।

দ্রুতই বৃদ্ধাশ্রমের কর্তব্যরত ডাক্তার এল। ইসিজি করা হলো। সবরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই ডাক্তার ঘোষণা করলো, 'উনি ইন্তিকাল করেছেন'। সেও প্রায় আধাঘন্টা আগে। উপস্থিত স্বজনদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। শুধু জমিলা ভাবীই কাঁদছেন না।

ডাক্তার ছাড়পত্রে লিখলেন, Mr. Kalim uddin Hawlader (68) s/o Mr. Jamir uddin Hawlader has been expired about half an hour before due to hurt attack'. ♦

বজর সবির

রুদাকি পুরস্কার-১৯৮৯ বিজয়ী তাজিক কবি ও রাজনীতিক

গাজী সাইফুল ইসলাম

সাম্প্রতিকালের কবি হওয়া সত্ত্বেও বজর সবিরকে (Bozor Sobir) মনে করা হয় তাজিকিস্তানের সর্বকালের সেরা কবিদের একজন। ১৯৮৯ সালে তিনি দেশের সর্বোচ্চ রুদাকি পুরস্কারে ভূষিত হন এবং ১৯৯০ সালের মার্চে তিনি তাজিক পার্লামেন্টের ডিপুটি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি হতাশাজনক হওয়ায় ১৯৯১ এর সেপ্টেম্বরে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৯৩ সালে আন্তঃজাতিগত বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা বৈরিতা সত্ত্বেও তিনি সোভিয়েত যুগে তাঁর নিজস্ব তাজিক ভাষায় লিখে বিশ্বের দৃষ্টি কাড়েন। ১৯৭৯ সালে রাশিয়ায় প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহের বদৌলতেই তাঁর কবিতা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

"খুব কাছে থেকে তাকাও আমার দিকে
আরও ভালো করে জানতে হলে
আমার মতো দেখো আমাকে
খুরাসান থেকে কুসহানের ইতিহাসের মতো।
আহা আমি, আমি, এই আমিই
তৈরি করেছি বামিয়ান, নির্মাণ করেছি কাফিয়ান।
শেষত হারিয়েও ফেলেছি!
দরবেশের সিংহাসন ছিল আমার পথের পরে
সেটি ধ্বংস করে এসেছি।
ক্রীস্যাসের সম্পদ ছিল আমার হাতের পরে
সে সব হারিয়ে ফেলেছি,
ধুলোয় পড়ে থাকা খড়ের চেয়ে
এসবের অধিক মূল্য দিইনি আমি।
আহা, আমি কাঁদছি আর কাঁদছি
শোকার্ত কান্নায় ভরা কণ্ঠ আমার।"

বজর সবির দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে নিজের কঠিন বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন কোনো প্রকার রাখ-ঢাক না রেখে। সত্য প্রকাশে থেকেছেন নির্ভীক যোদ্ধার মত। ভাষার ব্যবহার করেছেন ধারাল অস্ত্রের মত। তাঁর 'মাতৃভাষা' বা 'মায়ের কণ্ঠ' কবিতাটি যেন তাজিকদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত অবস্থার বেদনাদায়ক ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি।

''যা কিছু এ পৃথিবীতে ছিল, হারিয়ে গেল
যা ছিল বল্‌খ আর বোখারায়, হারিয়ে গেল
এখানে বিচারালয় আর আদালতে মহান যে ঐতিহ্য ছিল, হারিয়ে গেল।
এখানে মাটির বিছানায় পাতা যে সিংহাসন ছিল, হারিয়ে গেল ..."

মিখাইল গর্বাচেভের গ্লাসনস্তের সময় পার্লামেন্টে এক ভাষণে কবি বজর সবির রাশানদের অনুশোচনা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন: ''ভাইয়ের খুনে হাত রাঙিয়ে গলায় মেডেল পরা বড় লজ্জার।" এটা স্পষ্ট যে, ১৯৯০ এর আগে সোভিয়েত বিরোধী কবিতা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। 'আর্মেনিয়া বিরোধী' আন্দোলন বিক্ষোভ দমন করার জন্য যখন তাজিকিস্তানে রাশান সেনা মোতায়েন হলো, এসএসআর-এর প্রথম সেক্রেটারি 'কাহার মাখকামভ'-এর বিরুদ্ধে যখন তাজিকরা রাস্তায় নামল সৈনিকদের গুলিতে বহু তাজিক হতাহত হলো। বজর সবির তখন 'Kneads the paste with blood,'

কবিতাটি লিখে তরুণ তাজিকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ১৯৯০ এর সেই আন্দোলনের সমর্থনে লেখা কবিতাটিতে দু'টি জোরালো বিরোধীতা প্রকাশ পায়: রাশিয়ান ও সোভিয়েত সেন্টিমেন্টের বিরোধীতা। তিনি লিখেছিলেন:

''তার (রাশিয়ার) বন্ধুত্ব
ভেড়া দিয়ে নেকড়ে হত্যার বন্ধুত্ব
তার বিশ্বাসঘাতকতা নির্মূল হোক, নির্মূল হোক!
স্মরণ করছি তার ভাতৃত্ববিষয়ক বক্তৃতা,
প্রতিটি বাক্য ছিল আমাদের বন্দী করার ফাঁদ...
... বর্তমান পৃথিবীতে
রাশিয়া মানে হলো:
আর্মেনিয়ানদের রক্ত, জর্জিয়ানদের রক্ত
মুলদাভিয়ানদের রক্ত, লিথুভিয়ানদের রক্ত
আজারভাইজেনিয়ানদের রক্ত, তাজিকদের রক্ত
...
লাল কম্যুনিস্টদের লেজ
তাদের 'দুমা'র পেছনে পেছনে যায়
...
একটি সরকার হিসেবে রাশিয়া
একটি রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া
একটি নীতি হিসেবে রাশিয়া
শুধু রাশানদেরই কুরবানী দেয়নি
এর সঙ্গে যুক্ত করেছে অন্য অনেক মানুষকে,
অন্য অনেক জাতিকে।

রাশান শিশুদের রক্তে
রাশান মায়েদের চোখের জলে
তারা তৈরি করেছে সমুদ্র।
রাশিয়া যখন লেলিনের লাল ইতিহাস রচনা করেছে
তৈরি করেছে সমূদ্র...এভাবেই
কত যে রাশানের জীবন প্রদীপ নিভেছে
তার গৌরবদীপ্ত অতীত না জেনেই।''

দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ এখানে অনুবাদ করা হলো। তার কবিতাতেই প্রথম মানুষ জানতে পারে: রাশান সরকার শুধু ইউএসএসআর এর জনগণের অধিকার হরণ করেনি, খোদ রাশান জনগণের অধিকারও হরণ করেছে। এই কবিতার প্রথম ক'টি বাক্য রাশান-বিরোধী স্লোগানে পরিণত হয় এবং যা রাশান ভাষা-ভাষী লোকদের তাজিকিস্তান থেকে বিতাড়িত করে।

বজর সবিরের একটি কবিতা রয়েছে যাতে তার পিতৃভূমির ইতিহাস তুলে ধরে। এর চিত্রকল্প পাঠকদের আলোড়িত করে। যেমন:

''নিজাম-আল-মূলকের ঘাড় থেকে ফোঁটায়, ফোঁটায় ঝরে যে রক্ত তা যে আমার জন্মভূমিরই রক্ত।...'' তাজিকদের উত্থান-পতনের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন হয়েছে বজর সবির আর লুইগ শেরালির কবিতায়। তাঁদের দু'জনের কবিতাতেই 'সামানিড'দের তিক্ত ভাগ্যের কথা স্থান পেয়েছে, যা পাঠকদের জন্য মর্মপীড়নকর। নিচের কবিতায় বজর সবির নিজেকে সম্বোধন করেন, যাতে তাঁর কণ্ঠ অনেক দুঃখপূর্ণ, কিন্তু এরপরও কবিতাটির ব্যাঙ্গাত্মক সুরটি সুস্পষ্ট। যেমন:

...লজ্জিত, লজ্জিত, আমি লজ্জিত আমার কৃতকর্মের এজন্য।
আমি আগে ছিলাম, কিন্তু কোথায় ছিলাম, কী ছিলাম?
আমার মুখটি ওই দুঃখ জর্জড় চিত্রটিতে রয়েছে
যা সিস্তানের মিনার আর অট্টালিকাগুলো থেকে দেখা যায়।
আমার দুঃখ এ পাথরগুলোয়, যারা রুদাকি আর সামানিডদের
কবর পাশে নিরবে চোখের পানি ফেলে।...
দারার মুকুট ছিল আমার পথের ওপর,
আমি ধ্বংস করেছি কুরানের সম্পদ, যা ছিল আমার হাতে
আমি অপচয় করেছি, খড়ের টুকরো সমতুল্য মনে করেছি
এরপর নিক্ষেপ করেছি ময়লার ঝুড়িতে।

লজ্জিত, লজ্জিত, আমি লজ্জিত আমার কৃতকর্মের এজন্য।
সম্মানীয় আভিসিনাকে আমি বাদ দিয়েছি (Avicenna) বোখারা থেকে
মহান আল-তিরমিজিকে গতরাতে আমি নিক্ষেপ করেছি আমো নদীতে
নিজাম আল-মূলকের রক্তপাত করেছি আমি
এবং আমিই রক্তপাত করেছি আমার দেশের শিরা থেকে...।

বজর সবিরের কবিতা

কবিতার গাছ
(মোমিন কানোয়াতকে)
ক্ষয়ে যাওয়া সব কিংবদন্তী মাথা চাড়া দিচ্ছে
ধীরগতির বুদ্ধির জগৎ হতে,
অবিরাম সাহস সঞ্চয় করছে প্রবহমান পানি থেকে,
বাষ্পীয়মান আর্দ্রতা থেকে,
না জীবনের সঙ্গে সঙ্গোবদ্ধ হয়ে, না তার থেকে ছাড় নিয়ে
এটি সিঁচিত হয়েছে কবির হৃদয়ের ক্ষত থেকে
রক্তের জীবন্ত ফেনার সঙ্গে মিলেমিশে।

লালরঙ বেদনা আর বিপদাশঙ্কার রঙ
আমি সেই রঙে গাছগুলোর ছবি আঁকি–
যেখানে, ঝিঁঝির ডাক আর পত্র-পল্লবের মর্মর
সুরলহরী হয়ে বেজে চলছে একটানা।
দখলদাররা এখানে গুলিবিদ্ধ করেছে
এক তরুণ ভবিষ্যৎ বক্তাকে,
যার হৃদয়ের গভীরে ছিল আমাদের পুরনো ভাষা,
যার ধমনীসমূহে, হৃদপিণ্ডের অলিতে গলিতে আগুন জ্বলছিল
বংশ পরম্পরা, অগ্নিগর্ভ শব্দ আর বাক্যে।

কবিতার শব্দাবলী জীবন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকে
ফল হয়ে নিক্ষেপিত হয়
কবির পায়ের কাছে, যা অধিক সুখকর,
পাকা ফল যেন আল্লাহতালারই আশীর্বাদ।
তবে কিছু ফল কাঁচা–তিক্ত স্বাদযুক্ত!
প্রবাদে আছে: দূরবর্তী পাপীর উদ্দেশ্যে
সর্বশক্তিমানের ধনুক থেকে ছুটে আসা তীর
বিদ্ধ করে প্রজ্জ্বলিত হৃদয়,
এরপর তারা পরিণত হয় বৃক্ষে এবং এরপর
ওপরে উঠে যায় অশেষ চিরন্তনী গর্বের দিকে...
কিন্তু ভাবুকের কাছে ধর্ম আর জগৎ চিন্তা একই

আত্মিক আর বৈশ্বিক;
এবং যে কবিতার বৃক্ষটিতে আমি চড়েছি
এটিও একটি আশ্রয়, কিন্তু জীবনছাড়া আশ্রয় কি হয়?
সকল কালের ধনুক থেকে, যুগারম্ভের কম্পন থেকে
তুমি যদি গুলি বিদ্ধ কর ভূমিকে
এর ভেতরে প্রবেশ করার জন্য,
তার ধারাল অন্তর্বেদনার প্রান্তবর্তী না হয়ে
স্পর্শ করতে পারবে না তার হৃদয়!
তোমার এ কবিতার উত্থান হতে পারে
সেই বীরদের দেহাবশেষের ছাই থেকে,
যারা মরেছে যথার্থ কারণে...

ইংরেজি অনুবাদ: অলগা ইনো

মাতৃভাষা

ও তাজিক জনগণ
ও দুঃখী মানুষেরা
এতিমের মত অশ্রু তোমাদের চোখে
বন্দির মত ক্ষোভ তোমাদের অন্তরে
সবকিছু তোমাদের ছিল এখন কিছু নেই।

তোমাদের স্বদেশ আর কাফনের কাপড় পর্যন্ত
ওরা কেড়ে নিয়েছে,
ওরা ভূমি দস্যু আর কবর চোর।

নিঃস্ব, সহায় সম্বলহীন তোমাদের শত্রুরা
আজ ধনী তোমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে।
তোমরা যখন সর্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছো
তোমাদের অশিক্ষিত শত্রুরা তখন চুরি করছে ইবনে সিনার রচনাকর্ম
তোমাদের ছিঁচকে চোর শত্রুরা তখন কুক্ষিগত করছে রুমির কবিতা
তোমাদের চিত্রকর্মের ব্যবসায়ীরা তখন হাতিয়ে নিচ্ছে বেযুদের চিত্রকর্ম
তোমাদের ফেলে যাওয়া গৃহে বসতি স্থাপন করছে
তোমাদেরই গৃহহীন শত্রুরা ।

তোমরা তাজিকরা রুস্তম ও সোহরাবের গদা
তুলে দিয়েছ তোমাদের শত্রুদের হাতে
সে সবের বদৌলতে নূড়ি সমান শত্রুরা আজ বিপজ্জনক, শক্তিশালী
তোমরা ভুলে গেছ নিজেদের নাম,
ভুলে গেছে কোথায় আছে রুদাকির কবর
তোমাদের খুনিরা সে সব বিক্রি করে কুড়োচ্ছে বিশ্বখ্যাতি।

তোমাদের মাতৃভাষা তোমাদের নিজেদের মায়ের সমান
সদা লেগে থাকে মুখ ও জিহ্বায়।
প্রতিটি তাজিক শব্দ মায়ের দুধ খেয়ে শক্তিশালী হয়
এবং প্রবেশ করে হাড়ের গভীরে।
গৃহহীন আগুন্তকের মত
বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্বের এ কোণ ও কোণে বসে
তোমরা একা একা সেই ভাষায় কাঁদ,
জলপ্রপাত শিক্ষা নেয় তোমাদের চোখের পানি থেকে
বাতাস আর বৃষ্টি দীক্ষা নেয় সে পানির বাষ্প থেকে
নদীকে তারা রুদাকির কবিতা শোনায়
বাতাসকে তারা আনোয়ারির গল্প বলে
আঘাতপ্রাপ্ত পশু যেমন বার বার তার ক্ষত চাটে,
তাজিকরাও তেমন জিহ্বা দিয়ে তাদের কষ্টের ক্ষত চাটে।

জগতের সকল বিশ্বস্ত সীমান্তের মত
তাজিকদের ভাষাই হলো তাদের সীমানা
একজন তাজিকের কণ্ঠেও যতদিন তার ভাষা থাকবে
ততদিন তার দেশ থাকবে।
এবং যার নিজস্ব ভাষা আছে তিনি অনেক বড় মানুষ।♦

ইসলামে শিক্ষকের মর্যাদা ও অধিকার

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদাবোধ প্রকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতীকী দিন। যদিও শিক্ষকদের সম্মান জানানোর জন্য কোনো দিনক্ষণ বা সময় নির্ধারিত নেই। তারা সব সময় জাতির কাছে সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার দাবিদার। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অতুলনীয় অবদানকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করার লক্ষ্যেই এ দিবটির সূচনা হয়। বিশ্বব্যাপী সব শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট এ দিনটি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করে আছে।

১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১৪৫টি দেশের সুপারিশের মাধ্যমে ইউনেসকো'র কাছে শিক্ষকদের জন্য 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'-এর দাবি তোলা হয়। ১৯৯৩ সালে বিশ্বের ১৬৭টি দেশের ২১০টি জাতীয় সংগঠনের প্রায় তিন কোটি ২০ লাখ সদস্যের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠন 'এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল' গঠিত হয়। তাদের ক্রমাগত দাবি ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে ইউনেসকো'র ২৬তম অধিবেশনে

ইউনেসকো'র মহাপরিচালক ড. ফ্রেডারিক এম. মেয়রের যুগান্তকারী ঘোষণার মাধ্যমে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের শুভ সূচনা করা হয়।

১৯৯৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কিত সাফল্যকে সমুন্নত রাখাসহ আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বের ১০০টি দেশে এ দিবসটি পালিত হতে থাকে, যা আজও অব্যাহত।

বর্তমান বিশ্বের ১০০টি দেশে 'এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল' (Education International - EI) ও তার সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন বিশ্ব শিক্ষক দিবসের জন্য মূল ভূমিকা রেখে দিবসটি পালন করে আসছে। যদিও শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের কোনো সময় ও দিনক্ষণের প্রয়োজন নেই। শিক্ষকরা সব সময়ই মর্যাদা ও সম্মানের পাত্র। তারপরও শিক্ষকদের প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষকতার মতো এ মহান পেশার অবদানকে স্মরণ করার জন্যই সুনির্ধারিত হয়েছে আজকের দিনটি। আজকের দিনে শিক্ষকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, শ্রদ্ধা ও সম্মান।

শিক্ষকদের অধিকার, মর্যাদা ও কর্তব্যের অপরিহার্যতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের মৌলিক প্রশিক্ষণ, ক্রমাগত শিক্ষা লাভ এবং শিক্ষক নিয়োগের গাইডলাইন নির্ধারিত হয়। শিক্ষকদের মর্যাদা, যোগ্য শিক্ষক তৈরি এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের উন্নয়নই সুপারিশমালার লক্ষ্য। এই সুপারিশমালার আলোকে পরবর্তী সময়ে UNESCO সিদ্ধান্ত নেয় ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের।

শিক্ষার অধিকার ও যোগ্য শিক্ষক পাওয়ার অধিকার সমার্থক। যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে না এবং আদর্শ ও সুনাগরিক হতে পারে না। যোগ্য শিক্ষক তৈরি করতে হলে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক ও অন্য বিষয়গুলোর সন্তোষজনক সমাধান দিতে হবে। আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা লাভের সুযোগ চলমান রেখে শিক্ষকদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে হবে এবং সে জ্ঞানের ভাণ্ডারই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষক সেভাবেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাই করা উচিত। শিক্ষার্থীর সাফল্যই একজন শিক্ষকের সাফল্য।

২০১৯ সালের শিক্ষক দিবসের থিম হলো- 'Young teachers : The futuer of the profession অর্থাৎ 'তরুণ শিক্ষকরাই শিক্ষকতা পেশার ভবিষ্যৎ।' তরুণরাই তাঁদের তারুণ্যের শক্তি দ্বারা যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে। তাঁরা আধুনিক মনমানসিকতাসম্পন্ন। তাঁরা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত সামাজিক চরিত্র ও কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে যুগের চাহিদা মোতাবেক নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন। একইভাবে তাঁরা ভবিষ্যৎ চাহিদার জন্য তৈরি হতে পারেন। তরুণ শিক্ষকদের সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁদের সব সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রদান করতে হবে।

শিক্ষকতার মহান পেশা অত্যন্ত সম্মানজনক ও মর্যাদাবান পেশা। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলগণেকে বিশ্ব মানবতার শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। শিক্ষকগণ মানুষ গড়ার কারিগর। একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে শিক্ষকের ভূমিকা সব চেয়ে বেশি। আল্লাহ্ তা'আলাও শিক্ষকদের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষক মাত্রই বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। কারণ শিক্ষকরা জাতির প্রধান চালিকাশক্তি। শিক্ষক মানুষ চাষ করেন। যে চাষাবাদের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নীতি-নৈতিকতা ও জীবনাদর্শের বলয়ে একজন শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও কর্মময় জীবনকে মুখরিত করে। পাশাপাশি পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র তার দ্বারা উপকৃত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে ঐশী জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টিকর্তা, মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের নীতিমালা শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিশ্বের সব শিক্ষকদের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা জানি, একজন আদর্শবান শিক্ষক সমাজ বদল ও গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আদর্শ শিক্ষকই শুধু পারেন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ও কাঠামো তৈরি করতে। এ জন্যই শিক্ষকতাকে অপরাপর পেশার মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না বলে অনাদিকাল থেকে এটি একটি সুমহান পেশা হিসেবে সমাজ-সংসারে পরিগণিত হয়ে আসছে। কারণ জ্ঞানই মানুষের যথার্থ শক্তি ও মুক্তির পথনির্দেশ দিতে পারে।

শিক্ষকের পরিচয়

শিক্ষকের শব্দের আরবী প্রতিশব্দ মুআললিম, ইংরেজিতে শিক্ষকের প্রতিশব্দ Teacher। যিনি ছাত্রদের জ্ঞান শেখানোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাকে শিক্ষক বলা হয়। (মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা, পৃ. ৪৪২; আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪)।

শিক্ষক সর্বদা জ্ঞান বিতরণের কাজে ব্রতী হন। শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা ও মর্যাদাপূর্ণ কর্ম। নবী করীম (সা) ছিলেন একজন মহান শিক্ষক। তিনি বলেন,

‘আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।’ (‘উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২)। অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ‘আমি সমগ্র বিশ্ব মানবতার সর্বস্তরের এবং সর্বক্ষেত্রের জন্য উন্নত চরিত্র শিক্ষাদানে আবির্ভূত হয়েছি।’ (আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫)।

জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ‘অজানাকে জানানো, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোতে আনয়ন নামসর্বস্ব মানুষ নামের জীবকে পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণের উপযোগী করে গড়া- এ মহৎ কাজ যিনি বা যাঁরা সম্পাদন করেন তাঁরাই শিক্ষক।’ (আল্লাহ্র হক ও মানুষের হক, পৃ. ১৪১)

এক কথায় বলা যায়, শিক্ষক তিনিই যিনি শিক্ষাদান করেন, জ্ঞান বিতরণের মহান ব্রত যার কাজ। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিতদেরই শিক্ষক বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের অভিব্যক্তি সুবিস্তৃত এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুবিধ; তিনি তাঁর আদর্শভিত্তিক জ্ঞান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যানুগ জ্ঞান অর্জনে, সচ্চরিত্র গঠনে এবং মেধা বিকাশে পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়োজিত করেন।

শিক্ষকের মর্যাদা

শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়। নবী করীম (সা) বলেছেন, ‘হে জনগণ! তোমরা জ্ঞান আহরণ কর, জ্ঞান তো একমাত্র শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর ফিক্হ অর্জিত হয় ফকীহ্-এর নিকট ফিক্হ অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তিনি তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।’ (আল-মু‘জামুল কাবীর লিত্-তাবারানী, রিজালুন লাম ইসাম্মূ ‘আন মু‘আবিয়াতিম, হাদীস নং ৯২৯)।

আল্লাহ্ তা‘আলা আলিমগণের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।’ (সূরা মুজাদিলাহ্ : ৫৮ : ১১)। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ‘মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যার সাওয়াব তার নিকট বরাবর পৌঁছতে থাকবে তা হচ্ছে- ইলম বা জ্ঞান। যা সে শিক্ষা করেছে অতঃপর তা শিক্ষা প্রদান করেছে।’ (সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবু ছাওয়াবি মু‘আল্লিমিন্ নাসাল খায়রা, হাদীস নং ২৪২; সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, হাদীস নং ২৪৯০; শু‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ৩১৭৪)।

ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে আলিমগণের প্রশংসা করেছেন এবং এর অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ্ এমন ঈমানদারগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে এমন ঈমানদারগণের ওপর যারা শুধু ঈমান এনেছে কিন্তু তাদের জ্ঞান দান করা হয়নি।'

শায়খ কুরতুবী (র) এ আয়াতটি উল্লেখের পর বলেন, আছার তথা হাদীছের বর্ণিত আছে, আলিমগণের মর্যাদা হবে নবীগণের পর। আর আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী, তারা উত্তরাধিকার হয়েছেন নবীগণের জ্ঞানের, তারাই এ জ্ঞান বর্ণনা করেছেন উম্মতের নিকট এবং তারা এ জ্ঞানকে জাহিলদের পরিবর্তন থেকে সংরক্ষণ করেছেন। (উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩)।

ইসলাম শিক্ষককে উচ্চমর্যাদায় ভূষিত করেছে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আদব শিষ্টাচার শিখো। তাকে সম্মান করো যার থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। (আল-মুজামুল আউসাত : ৬১৮৪)।

মানবজাতির সবচেয়ে বড় শিক্ষক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)ও শিক্ষক হিসেবে গর্ববোধ করতেন। তিনি তাঁর অন্যতম দু'আয় বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি শিক্ষকদের ক্ষমা করুন, তাদের দীর্ঘ হায়াত দান করুন।'

শিক্ষকের মান-মর্যাদা অপরিসীম। খলীফা হারুনুর রশীদ একবার তার সন্তানের শিক্ষার খোঁজখবর নিতে শিক্ষকের বাড়ি যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তার সন্তান ওই শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে। শিক্ষক তখন নামাযের জন্য ওযূ করছিলেন। তার সন্তান এবং শিক্ষকের এ অবস্থা দেখে খলীফা পরদিন শিক্ষককে ডেকে পাঠালেন। শিক্ষক তো ভয়ে অস্থির। তাঁর ধারণা হয়েছিল, রাজপুত্রকে দিয়ে পায়ে পানি ঢালানোর কাজ করিয়েছেন। এ অপরাধে নিশ্চয়ই তার কঠিন সাজা হতে পারে। যা হোক পরদিন ভয়ে ভয়ে দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা শিক্ষককে ভর্ৎসনা করে বলেন, তার সন্তানকে শিক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছে সঠিক আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কেন তার সন্তানকে এক হাতে পানি ঢেলে অন্য হাতে পা ধুয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হলো না। (তালিমুল মুতাআল্লিম, পৃ. ২২)।

শিক্ষকের অধিকার

সমাজ, দেশ ও আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। তারা সর্বদা মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। তাদের ধ্যান-ধ্যারণা সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে নিয়ে। শিক্ষার্থীকে যদি তারা প্রকৃত শিক্ষাদান করতে পারে

সেখানেই শিক্ষকের সার্থকতা। আর শিক্ষার্থীও যদি শিক্ষকের নিকট থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তাহলেই শিক্ষার্থীর জীবন আলোকিত হয়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক যে ভূমিকা পালন করে থাকে তার জন্য শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মান সবার নিকট আলোকজ্জ্বল। শিক্ষকের বেশ কিছু অধিকার রয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো,

১. শিক্ষাকে যাবতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলে শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে এর বিকল্প নেই। আল-কুরআনুল কারীমে অবতীর্ণ প্রথম আয়াতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' (সূরা আল-আলাক, ১-৫)।

২. আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর বিদ্যার্জন করা ফরয' (সুনানু ইবনু মাজাহ, পৃ. ২২০)।

৩. একজন প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্যিকারভাবে শিক্ষিত শিক্ষক সমাজ বদলে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। আদর্শ শিক্ষকই শুধু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে পারেন। এ জন্যই শিক্ষকতাকে অপরাপর পেশার মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না বলে অনাদিকাল থেকে এটি একটি সুমহান পেশা হিসেবে সমাজ-সংসারে পরিগণিত। কারণ জ্ঞানই মানুষের যথার্থ শক্তি ও মুক্তির পথনির্দেশ দিতে পারে। এ সম্পর্কে নবী (সা) ইরশাদ করেন, 'দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও পদ-গৌরব লোভনীয় নয়। তা হলো- ১. ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; ২. ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ বিদ্যা তথা জ্ঞান দান করেছেন এবং সে অনুসারে সে কাজ করে ও অপরকে শিক্ষা দেয় (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৭১)।

৪. শিক্ষা অনুযায়ী মানব চরিত্র ও কর্মের সমন্বয় সাধনই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাগিদ। নিজে শিক্ষা অর্জন করার পরক্ষণেই অপরকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ও চরিত্র গঠন করার দায়িত্বও শিক্ষকের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আল্লাহর পরে, রাসূলের পরে সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মহানুভব, যে বিদ্যার্জন করে ও পরে তা প্রচার করে' (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৪৬৩৯)।

৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার ব্যাপকীকরণে সদা সচেষ্ট ছিলেন। নবী করীম (সা) বদরের যুদ্ধবন্দিদের

মুক্তির জন্য মদীনার শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার চুক্তি করেছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

শিক্ষকরা সমাজের বিবেক ও স্পন্দন। সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি দূর করার ব্যাপারে শিক্ষকদের অবিস্মরণীয় অবদান আজও এ ভূখণ্ডের মানুষ ভক্তিভরে স্মরণ করে। শিক্ষকরা হচ্ছেন দেশ গড়ার প্রধান নিয়ামক শক্তি। তাই ইসলামের আলোকে শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানে তৈরি করে তুলতে হবে। জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে পর্যন্ত যেতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করো।'

খেলাফতের যুগেই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে তখন শিক্ষকের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা হয়েছিল। যদিও দ্বীনি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষকরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান বিতরণ করতেন। আর তারা যেহেতু নিজেদের জীবিকার পেছনে ব্যতিব্যস্ত সময় পার না করে শান্ত মস্তিষ্কে জ্ঞান বিতরণের পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাই তৎকালীন খেলাফত ব্যবস্থা বা সরকার তাদের সম্মানে অভিষিক্ত করেছিল। তাদের জ্ঞান বিতরণের এ মহৎ কাজকে সম্মান জানিয়ে পরিবার-পরিজনের যাবতীয় আর্থিক খরচ বহন করেছিল, যেন জীবনের তাগিদে শিক্ষকদের ভিন্ন কোনো পথে পা বাড়াতে না হয়।

উমর (রা) ও উছমান (রা) তাদের শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারা শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। উমর (রা), ওছমানের (রা) যুগে মুয়াজ্জিন, ইমাম ও শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়া হতো (কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৬৫)।

বস্তুত ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও ইসলামের মনীষীরা শিক্ষক ও গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়ে আসছেন। নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণের দীক্ষাও দিচ্ছেন নিরন্তরভাবে। দেশব্যাপী শিক্ষকদের বৈধ অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা করা, শিক্ষকদের জীবনের মান উন্নত করার ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি এবং শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা, সর্বোপরি দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

শিক্ষক আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার

শিক্ষকরা হলেন সুনিপুণ কারিগর। শিক্ষা ছাড়া আলোকিত মানুষ সৃষ্টি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শিক্ষক শুধু শিক্ষাদানই করেন না, তিনি মানুষ গড়ার কারিগরও। শিক্ষক ও মা-বাবার অবদান অস্বীকার করে, এমন একজনকেও পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মা-বাবা যেমন সন্তানদের ভালোবাসা, স্নেহ,

মমতা দিয়ে বড় করেন, ঠিক তেমনি শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার আলো দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে যান। স্নেহ, মমতা, ভলোবাসা তো বটেই। তাদের শিক্ষার আলো যেমন শিক্ষার্থীদের সামনের পথ চলাকে সুদৃঢ় করে, তেমনি তাদের স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা তাদের অনুপ্রাাণিত করে। শিক্ষক সম্পর্কে নিম্নে কয়েক মনীষীর মতামত তুলে ধরা হলো-

১. উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ডের বলেন,

> 'একজন সাধারণ শিক্ষক বক্তৃতা করেন, একজন ভাল শিক্ষক বিশ্লেষণ করেন, একজন উত্তম শিক্ষক প্রদর্শন করেন, একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন।'

২. আমেরিকার ইতিহাসবিদ হেনরি এডামস শিক্ষকের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

> 'একজন শিক্ষক সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলেন, কেউ বলতে পারে না তার প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয়।'

৩. দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন,

> 'শিক্ষক সমাজ হচ্ছেন প্রকৃত সমাজ ও সভ্যতার বিবেক। এ কারণেই শিক্ষকদের বলা হয় সমাজ নির্মাণের স্থপতি।'

৪. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি বলেন,

> 'শিক্ষক হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নতুন প্রজন্মের কাছে যুগ-যুগান্তরে সঞ্চিত যাবতীয় মূল্যবান সাফল্য হস্তগত করবেন, কিন্তু কুসংস্কার, দোষ ও অশুভকে ওদের হাতে তুলে দেবেন না।'

৫. ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন বলেছেন,

> 'সমাজ পরিবর্তনের পূর্বশর্ত মানুষের পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের অভিভাবকত্ব শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব।'

৬. কার্ল জং সুইস মনোবিজ্ঞানী বলেন,

> 'ব্রিলিয়ান্ট শিক্ষকদের প্রতি লোকেরা সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকায় তাদের প্রতি, যারা আমাদের মানবিক অনুভূতিকে স্পর্শ করে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর সেই মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে শিক্ষকের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।'

শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের হাত ধরেই মূলত আমরা জ্ঞানের মহাসাগর পাড়ি দেই। শিক্ষকরা প্রদীপের মত নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলো দান করেন, অর্থাৎ শিক্ষক অমর, তিনি বেঁচে থাকেন ছাত্রের আদর্শের মাধ্যমে শিক্ষকরা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা দেন তা কিন্তু নয়। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন।

একজন আদর্শ শিক্ষকের কিছু কাজ ও দায়বদ্ধতা আছে। এ কাজ ও দায়বদ্ধতা সহকর্মীদের কাছে, সমাজের কাছে, দেশ ও জাতির কাছে, আগামি প্রজন্মের কাছে। একজন সফল মানুষের পেছনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জাগ্রত করা। শিক্ষার্থীদের অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া এবং বাস্তব ও সত্য অনুসন্ধানে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। শিক্ষক শুধু সফল নয়, একজন ভালো মানুষ হতে শেখান। প্রত্যেক শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ আদর্শ শিক্ষা। শিক্ষককে হতে হয় নৈতিক আদর্শে উজ্জ্বল। যিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে জ্ঞান তৃষ্ণা জাগিয়ে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর পরিচর্চা করে শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষে পরিণত করেন। আমাদের দেশে আদর্শ শিক্ষকের বড় অভাব। সততা, নৈতিকার ঘাটতি সর্বত্রই। শিক্ষার মানোন্নয়নের ঘাটতিও কম নয়। শিক্ষাকে বাণিজ্যে পরিণত করার তৎপরতা লক্ষণীয়।

শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের অন্যতম দাবি। এটি অর্জনের অন্যতম কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষক প্রদীপের মতো নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলো দান করেন, অর্থাৎ শিক্ষক অমর তিনি বেঁচে থাকেন ছাত্রের আদর্শের মাধ্যমে। প্রত্যেক শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকা উচিত আদর্শ শিক্ষা প্রদান। একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের পূর্বশর্ত, যা পালন করেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। প্রতিষ্ঠান প্রধান শুধু প্রিন্সিপালই নন তিনি একজন শিক্ষকও।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস (৫ অক্টোবর) বিকশিত অবদানের মাধ্যমে সচেতনতা, সমঝোতা এবং উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা শিক্ষকদের শিক্ষার প্রগতিকে আরও প্রসারিত করবে নিঃসন্দেহে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে শিক্ষার স্বীকৃতি আদায় করে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ও শিক্ষাদাতা শিক্ষকদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষকসমাজ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বৈষম্য-বঞ্চনার অবসান দাবিতে, নির্যাতন-নিপীড়ন প্রতিরোধে শিক্ষকের ন্যায্য অধিকার রক্ষার উদ্দেশে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে তাঁদের মূল ধ্বনি: 'শিক্ষক বাঁচলে শিক্ষা বাঁচবে, শিক্ষা বাঁচলে দেশ বাঁচবে'। দেশব্যাপী শিক্ষকদের বৈধ অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা করা, শিক্ষকদের জীবনের মান উন্নত করার ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করা এবং শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা সর্বোপরি দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেকে সে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে। এ সব কিছুর পেছনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ভূমিকাই মুখ্য। সমাজ পরিবর্তনে এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণে ও তাঁদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত তৈরিতে শিক্ষকরা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকতা পেশার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিক্ষকদের সামাজিকভাবে মর্যাদার আসনে বসানো প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। যে সমাজ শিক্ষককে সম্মান দেয় না, সে সমাজে মানুষ তৈরি হয় না। এ সচেতনতাবোধের আলোকে শিক্ষক দিবসে যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

আমাদের দেশে অতীতে শিক্ষকদের যেমন সামাজিক মর্যাদা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও পবিত্র সমম্পর্ক ছিল তা; এখন অনেক জায়গায়ই অনুপস্থিত। ষাটের দশকেও শিক্ষকরা সমাজের সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্ররাও শিক্ষকদের ভয় পেত, শ্রদ্ধা করত। শিক্ষকরা ছাত্রদের বেশ স্নেহ করতেন। কিন্তু আজকালকার দিনে সে রকম অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই নেই। আগে অনেক ছাত্র স্বপ্ন দেখত, সে ভবিষ্যতে শিক্ষক হবে। কিন্তু এখন কোনো ছাত্রের জীবনের লক্ষ্য শিক্ষক হওয়া এমন দেখা যায় না। ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এ অবস্থা একটা দেশের জন্য শুভ কিছু নয়। শিক্ষকদের মর্যাদার আসনটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

শিক্ষক-ছাত্রের সুসম্পর্কের সেই পবিত্র স্থানের বিচ্যুতির জন্য শিক্ষক, ছাত্র ও রাজনীতিবিদ সবাই দায়ী। অনেক রাজনীতিবিদ চান শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতে। কিছু কিছু শিক্ষকও চান, ছাত্রদের বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে নিজের সুবিধা আদায় করতে। এভাবে ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক-রাজনীতি আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার বাইরে গিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের বেড়াজালে পড়ে কলুষিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে আদর্শ, নীতিমান ও মেধাবী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে নোংরা রাজনীতি এবং ব্যক্তি ও কোটারি স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিকতা, উদারতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্ক বজায় রেখে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষকের মর্যাদা সমুন্নত রাখাই হোক বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অঙ্গীকার। (এ কে এম শহীদুল হক, শিক্ষকের মর্যাদা ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সাবেক আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ)।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষকতা অতি সম্মানিত ও মহান পেশা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সামাজিক দায়িত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে শিক্ষকতার পেশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিক্ষকতার মতো মহান পেশাকে আমাদের সমাজে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে দেখা যায়। যা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অমানবিক কাজ। আবার অনেক শিক্ষককে দেখা যায়, 'শিক্ষকতার এ মহান পেশাকে কলংকিত করে নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে জড়িয়ে পড়ে; এটাও অত্যন্ত ঘৃণিত ও বর্জনীয় কাজ। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেছেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছাড়া কেউই আমার আপন নয়।' এই হাদীসের আলোকে বলা যায়, যারা শিক্ষকদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, অপমান করে-তারা তো পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ্র (সা) আপনজনদেরই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছে; তাদেরই অপমান করছে। আর রাসূলুল্লাহর (সা) আপনজনদের সঙ্গে বিরূপ ধারণা পোষণকারী কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সুপারিশ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অঙ্গীকার হোক; শিক্ষকের প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা। আসুন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের অনুসরণ করি। শিক্ষকদেরকে যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করি। শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করে দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করি। ♦

লেখক : প্রফেসর ও সভাপতি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে জাতীয় শোক দিবস পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সকল কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস-২০২০ পালন করেছে তার কয়েকটি–

১৪ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

১৪ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫

আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করা হয়। মুনাজাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়।

টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতার মাজারে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১৫ আগস্ট সকালে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব) ফারুক খান এমপিসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

১৫ আগস্ট শনিবার সকাল ৮ টায় শুরু হয়ে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ জন কোরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। এরপর স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা, মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নূরুল ইসলাম পিএইচডি।

মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে ১৫ আগস্ট সকাল ৯.৩০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ্ জামে মসজিদে ১৫ আগস্ট সকাল থেকে খতমে কোরআন শুরু হয়ে বাদ যোহর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। মুনাজাতে দেশের জন্য শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ চেয়ে এবং মরণব্যাধি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরম করুণাময়ের অশেষ রহমত কামনা করা হয়। দোয়া, মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে ১৫ আগস্ট সকালে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহীর হেতেম খাঁ মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে হেতেম খাঁ বড় মসজিদ কমপ্লেক্সে ১৫ আগস্ট সকালে খতমে কোরআন এবং মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন হেতেমা খাঁ বড় মসজিদের সম্মানিত পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মো. ইয়াকুব আলী।

১৫ আগস্ট বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

১৫ আগস্ট বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়। এছাড়া বিরাজমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা হয়।

মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

১৬-১৭ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৫০৫টি উপজেলা কার্যালয় এবং ১৮ আগস্ট ৬৪ বিভাগীয়/জেলা কার্যালয় ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে ২ লক্ষ বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৫ আগস্ট সকালে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে ধর্মসচিব মো. নূরুল ইসলাম পিএইচডি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ আগারগাঁও কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করেন।

দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ইসলামিক

ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয়সহ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে ১৫ আগস্ট দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

১৯ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ১৯ আগস্ট বুধবার সকাল ১১ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জুম ওয়েবিনার এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করে কোটি বাঙালির মনের আশাকে পূরণ করেছেন। যোগ্যতার দিক থেকে বিশ্বের দরবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনন্য শিখরে পৌঁছেছেন। সারা বিশ্ব এখন তাঁকে ১০ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতার একজন বলে মনে করে। বঙ্গবন্ধু যা চিন্তা করতেন, বাংলাদেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে বলেই আজ তিনি দেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। শেখ হাসিনা মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছেন। দেশ থেকে জঙ্গিবাদ দূর করেছেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে এ দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এ দেশকে দেশের মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে ভালোবাসতেন। ইসলাম বা অন্য কোনও ধর্মকে তিনি কখনো ছোট করে দেখেননি। তিনি কাকরাইল মসজিদকে ইসলামি চর্চার জন্য সম্প্রসারিত করেছিলেন, তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস-এর গভর্নর জনাব র.আ.ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস-এর গভর্নর প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস-এর গভর্নর আলহাজ্জ

মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস-এর গভর্নর সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ ও কমপ্লেক্সের খতিব মাওলানা সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. নূরুল ইসলাম পিএইচডি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনস্থ মসজিদসমূহের সম্মানিত ইমাম ও খতিব, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষক ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ যুক্ত হন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন শোলাকিয়া ঈদগাহের গ্রান্ড ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ।

অনলাইনে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিরাজমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় অনলাইনে জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ৩টি বিষয়– ক্বিরআত, ৭ই মার্চের ভাষণের অনুকৃতি ও উপস্থিত বক্তৃতা বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রতিযোগীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ৮ বিভাগের প্রতিযোগীদের নিয়ে ৮দিন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে ২৪ আগস্ট শেষ হয়। এরপর বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীদের নিয়ে ২৭ আগস্ট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকগণ ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে বসে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। ৩১ আগস্ট সকাল ১১ টায় কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বরিশাল, সিলেট নওগাঁ, নাটোর, শরীয়তপুর, শেরপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, নেত্রকোনাসহ বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় থেকে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ফারুক আহমেদ (যুগ্ম সচিব), ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকসহ কর্মকর্তারাও অনলাইনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ। জাতীয় পর্যায়ে ১২ জন ও বিভাগীয় পর্যায়ে ৯৬ জনসহ মোট ১০৮ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- টাকা, ২য় পুরস্কার ৮,০০০/- টাকা ও ৩য় পুরস্কার ৬,০০০/- টাকাসহ বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের ১ম পুরস্কার ৩০০০/- টাকা, ২য় পুরস্কার ২০০০/- টাকা ও ৩য় পুরস্কার ১০০০/- টাকাসহ বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠান

শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর 'ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব স্টুডিওতে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ধারণ ও নির্মাণ করা হয়। ১৫ পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠান ১৭-৩১ আগস্ট ২০২০ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সম্প্রচারিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক আমাদের নতুন সময় ও দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা'র জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা প্রকাশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা পত্রিকার সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর দেশের প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকগণের তথ্যবহুল লেখনীর মাধ্যমে সাময়িকীকে সমৃদ্ধ করা হয়।♦